সুন্নাত ও বিদআত

॥ পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

সুন্নাত ও বিদআত

সংকলন
মুফতী মীযানুর রহমান রায়হান

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৫০০৯৮২৪, ০১৭৫৩১৮০৫৫৫

সুন্নাত ও বিদআত

সংকলন
মুফতী মীযানুর রহমান রায়হান

প্রকাশক
মাওলানা মাহমুদুল হাসান (বড় হুজুর)
মহাপরিচালক : নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষাবোর্ড
প্রতিষ্ঠাতা : নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
মোবা : ০১৯৭৫-০০৯৮২৪

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০২৪

অঙ্গসজ্জা
জাগরণ বর্ণসাজ, ০১৪০৮-৮৩৭৮০০

মূল্য
১৬০.০০ (একশ ষাট) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
ওই সকল নিষ্ঠাবান অনুসারীদের প্রতি,
যাঁরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাত্মকভাবে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন।

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আদম সন্তানের জন্য কোরআনুল কারীমের বিধানসমূহ পালনের পদ্ধতি ও উপায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামী শরীয়ত অনুসরণে কাউকে জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানে কিছুসংখ্যক মানুষ নবীপ্রেমের নামে এমন কিছু কাজ করছে, যা স্পষ্টত নবীজির তরীকার খেলাফ। তারা সুন্নাত ও বিদআতের মধ্যকার পার্থক্য রেখাও তুলে দিতে চায়। বিশেষ করে আমাদের এই উপমহাদেশে শরীয়তের নামে এমন কিছু রীতিনীতির উদ্ভব ঘটেছে, যা ইসলামের সোনালি যুগে কখনো ছিল না। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদি রাসূলকে অনুসরণ করতে হয়, তাহলে এই নতুন রীতিনীতি ও বিদআতকে সমূলে উৎখাত করতেই হবে। এটাই শরীয়তের স্পষ্ট তাগিদ।

মুফতী মীযানুর রহমান রায়হান তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে এ বিষয়টির ওপরই অত্যন্ত সুনিপুণভাবে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি কোরআন ও হাদীসের আলোকে যেমন সুন্নাতের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করেছেন দ্ব্যর্থহীন-ভাবে, তেমনি বিদআতের নিদর্শনগুলোকেও তুলে ধরেছেন সাহসিকতার সাথে। এক্ষেত্রে অকাট্য দলীল-প্রমাণের ওপরই তিনি প্রধানত নির্ভর করেছেন, কোনো মহলের ইচ্ছা-অভিরুচিকে সামনে রাখেননি। এতটুকু পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে এ গ্রন্থখানি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। উম্মতের পথ-নির্দেশক হিসেবে এ গ্রন্থ কার্যকরী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ লেখকের শ্রম সার্থক করুন, এটাই কামনা করি।

—প্রকাশক

প্রসঙ্গ কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। অসংখ্য দরূদ ও সালাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। অগণিত রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুগামী উম্মতের প্রতি। প্রভুর এ রহমতের ধারা যেন কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের কর্তব্য দু-ধরনের : এক. তাঁকে সর্বাধিক ভালোবাসা ও সম্মান করা; দুই. তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা। এ দুটি বিষয় পরস্পর সম্পূরক। ভালোবাসা ও ভক্তি মানুষকে অনুসরণ ও আনুগত্যের পথে ধাবিত করে। আবার ক্রমাগত এ অনুসরণ ও আনুগত্য অনুসারীর মনে গভীর ভালোবাসা ও ভক্তির সৃষ্টি করে। সাহাবীদের জীবনে আমরা এর প্রতিফলনই দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল যেমন সীমাহীন, তেমনই নবীজিকে অনুসরণ করতে তাঁদের ঐকান্তিকতারও কমতি ছিল না।

ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মাঝে এখানেই মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একজন খ্রিষ্টান ঈসা আলাইহিস সালাম বা 'যিশু খ্রীষ্টকে' গভীরভাবে ভালোবাসেন, ভক্তি করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তিনিই তার মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা। কিন্তু যদি তাকে যিশুর আচার-আচরণ, অভ্যাস বা কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে সে বিশেষ কিছুই বলতে পারবে না। কারণ তার বিশ্বাস হলো, যিশুখ্রীষ্টের অনুসরণ-অনুকরণ বা আনুগত্য নয়; বরং তার প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা তাকে মুক্তি দেবে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিমের বিশ্বাস হলো, শুধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কর্মহীন বা আনুগত্যহীন ভালোবাসা নয়; বরং ভক্তিময় অনুসরণ ও আনুগত্যই তাকে চিরকল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখাবে। তাই একজন মুসলিম সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর আদর্শ বা সুন্নাত জানতে আগ্রহী।

ইসলামের সকল কাজের উৎস হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম। তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ ও আনুগত্যের উপরেই সকল জ্ঞান ও কর্মের ভিত্তি। নবীজির সঙ্গী-সাথিরা ছিলেন তাঁর অনুসরণে আপসহীন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রিয় নবীর পদ্ধতির সামান্য ব্যতিক্রম করেননি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, মুসলিম উম্মাহর সকল ধর্মীয় ও জাগতিক কাজকর্ম অবিকল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মতোই হোক। তাঁদের পরবর্তী দুই যুগে তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণ সেভাবে সমাজকে সুন্নাতের উপর রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাহাবীদের যুগের পর সমাজে বিভিন্ন সময়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু রীতিনীতি প্রবেশ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণ এবং যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি প্রচলিত হতে থাকে। কখনো আবেগের ফলে, কখনো অজ্ঞতার বসে কখনো পূর্ববর্তী ধর্মের বা সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবে এ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

আমাদের সমাজও এ ধারার বাইরে নয়। বর্তমানে ইসলামের নামে নতুন অনেক বিষয় প্রবেশ করেছে। কিছু কিছু বিদআত এতই প্রসার লাভ করেছে যে, কেউ তাকে ইসলামী তরীকার খেলাফ বলে মানতে চান না। অথচ বিষয়টি কখন কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হলো, তা কেউ জানেন না। তাই প্রকৃত সুন্নাতের পরিচয় লাভ করাই এখন উম্মতের বড় দায়িত্ব। এ পুস্তিকা লেখার পূর্বে এ বিষয়টিই আমাকে বারবার তাড়া করেছে।

মনে করলাম, দিন দিন সমাজে ইসলামের নামে যেভাবে বিদআতের প্রচলন ঘটছে, তাতে হয়তো একদিন সুন্নাত ও বিদআতের মধ্যকার পার্থক্যরেখা থাকবে না। তাই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে মানুষ যাতে নির্ভেজাল আমল করতে পারে, সেদিকেই আমি লক্ষ্য রেখেছি।

এ পুস্তিকা সুন্নাতের অনুসারী ও সুন্নাত বর্জনকারী উভয়ের জন্য উপকারী। যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবীজিকে অনুসরণ করতে চান, তাদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলবে। আর যারা এখনো বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজের পেছনে পড়ে সুন্নাতের আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, তারাও সুন্নাতের সঠিক পরিচয় পেয়ে যাবেন।

পুস্তিকাটি প্রকাশে যারা আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাঠক সমাজকে উপকৃত করে এ অধমের শ্রম কবুল করুন। আমীন!

বিনীত
মীযানুর রহমান রায়হান
নিজাম কান্দি, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
তারিখ : ১৭/০৬/২০১২ইং

সূ চি প ত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : সুন্নাতের আলোচনা.. ১৫

সুন্নাতে নববীর পরিচিতি ১৫

কোরআনুল কারীমে সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব ১৭

হাদীস শরীফে সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব.. ২০

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব ২৪

সুন্নাতের বাইরে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য নয়............................ ২৬

দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নাতসমূহ................................ ২৯

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সুন্নাতসমূহ.. ২৯

কানে আযান-একামত দেওয়া... ২৯

তাহনীক করা.. ২৯

ভালো নাম রাখা... ২৯

খারাপ নাম থাকলে তা পরিবর্তন করা ২৯

আকীকা করা ৩০

কথা বলতে শেখার পর কালিমা শিক্ষা দেওয়া ৩০

খতনা করানো... ৩০

পায়খানা-পেশাবের সুন্নাত তরীকা ৩১

মেসওয়াকের সুন্নাতসমূহ... ৩২

অযুর সুন্নাত তরীকা.. ৩৪

গোসলের সুন্নাত তরীকা ৩৫

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা ৩৬

বিষয় পৃষ্ঠা
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা ৩৭
আযানের সুন্নাত তরীকা ৩৭
আযানের জবাব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা ৩৮
ইকামত দেওয়ার সুন্নাত তরীকা ৩৮
ইকামতের জবাব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা ৩৯
নামাযের একান্নটি সুন্নাত ৩৯
রুকুতে ৮টি সুন্নাত ৪০
সিজদায় ১২টি সুন্নাত ৪১
নামাযের বৈঠকে ১৩টি সুন্নাত ৪২
জুমআর দিনের সুন্নাতসমূহ ৪৩
খুতবার সুন্নাতসমূহ ৪৩
ঈদুল ফিতরের সুন্নাতসমূহ ৪৪
ঈদুল আযহার সুন্নাতসমূহ ৪৫
যাকাত প্রদানের সুন্নাত তরীকা ৪৬
রোযার সুন্নাতসমূহ ৪৬
হজ্জের সুন্নাতসমূহ ৪৭
খানা খাওয়ার সুন্নাত তরীকা ৪৮
পান করার সুন্নাত তরীকা ৫১
ঘুমানোর সুন্নাত তরীকা ৫২
ঘুম থেকে উঠার পর সুন্নাতসমূহ ৫৩
পোশাক-পরিচ্ছদের সুন্নাতসমূহ ৫৪
পায়জামা পরিধান করার সুন্নাত তরীকা ৫৪
জামা পরিধান করার সুন্নাত তরীকা ৫৫
টুপি পরার সুন্নাত তরীকা ৫৫

বিষয় পৃষ্ঠা

জুতা পরিধানের সুন্নাত তরীকা ৫৫
চুল, নখ, গোঁফ ইত্যাদি কাটার সুন্নাত তরীকা ৫৬
চুলের সুন্নাত ৫৬
দাড়ি ও গোঁফের সুন্নাত ৫৬
বিয়ে-শাদীর সুন্নাত তরীকা ৫৭
বিয়ে পড়ানোর সুন্নাত তরীকা ৫৭
স্বামী স্ত্রীর গোপনীয় কিছু কাজ ৫৮
দাম্পত্য জীবন পরিচালনার সুন্নাত তরীকা ৫৯
ক্ষেত-খামার ও বৃক্ষরোপণের সুন্নাত তরীকা ৬১
সালাম বিনিময়ের সুন্নাত তরীকা ৬২
সালামের জবাব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা ৬৪
পরস্পরে কথা বলার সুন্নাত তরীকা ৬৪
ভ্রমণের সুন্নাত তরীকা ৬৭
ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা ৬৮
অন্যের ঘরে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা ৬৯
মজলিসের সুন্নাতসমূহ ৬৯
আতিথেয়তার সুন্নাত তরীকা ৭০
হাদিয়া দেওয়ার সুন্নাত তরীকা ৭১
রোগী দেখার সুন্নাত তরীকা ৭২
পশু-পাখি ও জীব-জন্তুর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা.................... ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : বিদআতের আলোচনা.................................. ৭৫
বিদআতের নিকৃষ্টতা ৭৫
বিদআত সম্পর্কে ভাষাবিদগণের বক্তব্য.................................. ৭৮

বিষয় পৃষ্ঠা

শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত ৭৯

ইবাদতের ক্ষেত্রে মনগড়া পদ্ধতি বিদআত ৮১

মনগড়া পন্থায় ইবাদত সম্পর্কে সাহাবীদের অভিমত ৮২

প্রচলিত কিছু বিদআত ৮৫

ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন ৮৫

প্রচলিত মিলাদের গোড়ার কথা ৮৭

ওরস উদ্‌যাপন ৯০

সম্মানবশত কবর পাকা করা ৯৩

কবরে বাতি জ্বালানো, গেলাফ চড়ানো ও ফুল দেওয়া ৯৬

জানাযার নামাযের পর দোয়া.. ৯৮

ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ ও পারিশ্রমিক গ্রহণ ১০০

মৃত ব্যক্তির ঘরে যিয়াফত খাওয়া ১০২

দিন-তারিখ ধার্য করে মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সাওয়াব করা ১০৪

আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম..১০৬

ওলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলার অপচেষ্টা................................১০৯

আবদুল ওয়াহহাব নজদীর আত্মপ্রকাশ.......................................১০৯

ওয়াহাবী চিন্তাধারা..১১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়
সুন্নাতের আলোচনা

সুন্নাতে নববীর পরিচিতি

'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ الطريق 'পথ'। কোরআনুল কারীমে এই 'সুন্নাত' শব্দটি বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

'এটাই আল্লাহর সুন্নাত, যা পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে আছে। আর আল্লাহর এ সুন্নাতে তুমি কখনো কোনোরূপ পরিবর্তন পাবে না।' (সূরা আল ফাতহ : ২৩)

সূরা বনী ইসরাইলের ৭৭ তম আয়াতে উল্লেখ হয়েছে,

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا

'আপনার পূর্বে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি, তাঁদের ক্ষেত্রেও এরূপ তরীকা ছিল। আপনি আমার নিয়মের মাঝে কোনো ব্যতিক্রম পাবেন না।'

এসব আয়াতে ব্যবহৃত 'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ طريقة অর্থাৎ পথ, পন্থা, রীতি ও পদ্ধতি হিসেবে দেখানো হয়েছে।

'সুন্নাত' শব্দটি যেমন আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়েছে, তেমনি নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে যখন 'সুন্নাত' শব্দটি ব্যবহৃত হবে, তখন বুঝাবে তাঁর সকল কথা, কাজ ও সম্মতি। এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।

আল্লামা আবদুল আযীয আল-হানাফী রহ. লেখেন,

لَفْظُ السُّنَّةِ شَامِلٌ لِقَوْلِ الرَّسُوْلِ وَفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَطْلُقُ عَلى طَرِيْقَةِ الرَّسُوْلِ وَالصَّحَابَةِ

'সুন্নাত' শব্দ হলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের কথা ও কাজ। আর তা নবীজির সাহাবীদের বাস্তব কর্মনীতি বুঝাবার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা আবদুল আযীয আল-হানাফী রহ. লেখেন,

السُّنَّةُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ

'কোরআন ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণনার সূত্রে পাওয়া গেছে, তা-ই সুন্নাত।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী মুয়ায ইবনু জাবাল রা.-এর কতিপয় শিষ্য বলেন,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِيْ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِيْ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ اَجْتَهِدُ رَأْيِيْ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِيْ رَسُوْلَ اللهِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায রা.-কে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি তোমার কাছে কোনো বিচারের দায়িত্ব আসে, তাহলে কীভাবে ফায়সালা করবে? মুয়ায রা. বলেন, আমি আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে বিচার করব। নবীজি প্রশ্ন করেন, যদি আল্লাহর কিতাবে (তোমার সমস্যার সমাধান)

না পাও? মুয়ায রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দ্বারা বিচার করব। নবীজি বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে বা রাসূলের সুন্নাতের মধ্যে (তোমার নির্দিষ্ট সমস্যার কোনো সমাধান) না পাও? তখন মুয়ায রা. বললেন, আমি সর্বাত্মকভাবে আমার বুদ্ধিমত্তা ও মেধা প্রয়োগ করে ফায়সালা দেওয়ার চেষ্টা করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকে হাত রেখে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে তাওফীক দিয়েছেন এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের, যা তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আবু বকর রা.-ও 'সুন্নাত' বলতে এই অর্থই বুঝিয়েছেন। এক মৃত ব্যক্তির দাদি এসে যখন তার মীরাসের দাবি করলো, তখন তিনি বললেন,

مَا لَكَ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِيْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِيْ حَتّٰى أَسْأَلَ النَّاسَ.

'আল্লাহর কিতাবে তোমার কোনো অংশ বর্ণিত নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেও আমার জানা মতে তোমার জন্য কোনো বিধান নেই। তুমি পরে এসো, আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

কোরআনুল কারীমে সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব

কোরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত তাঁর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্যের কোনো পথ নেই। নবীজির আনুগত্যের অর্থই হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর 'সুন্নাতের' আনুগত্য করা। ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

'যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করল, সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে ব্যক্তি বিমুখতা অবলম্বন করল, (হে মুহাম্মদ) আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।' (সূরা নিসা : ৮০)

আল-কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

'আমি (আল্লাহ) একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর অনুসরণ করা হয়।' (সূরা নিসা : ৬৪)

আল-কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ
عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

'বলুন, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।' (সূরা নূর : ৫৪)

আল-কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং (তাঁদের থেকে বিমুখ হয়ে) নিজেদের কর্ম বিনষ্ট কোরো না।' (সূরা মুহাম্মাদ : ৩৩)

আল-কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হইয়ো না।' (সূরা আনফাল : ২০)

আল-কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো; যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো।' (সূরা নিসা : ৫৯)

আল-কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

'তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা করো। আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রেখো, আমার রাসূলের কাজ দায়িত্ব প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।' (সূরা মায়েদা : ৯২)

আল-কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ٭ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।' (সূরা হাশর : ৭)

আল-কোরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল ও দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো। বস্তুত যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না।' (সূরা আলে ইমরান : ৩১-৩২)

হাদীস শরীফে সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব

কোরআনুল কারীমের ন্যায় হাদীস শরীফেও 'সুন্নাতে নববীর' অনুসরণ ও অনুকরণ করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুন্নাতের অনুসরণ করাই যে মুক্তির মাধ্যম ও সুন্নাতের বাইরে যাওয়াই যে ধ্বংসের কারণ, তা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কর্মে ও বর্জনে অতি সূক্ষ্মভাবে উম্মতকে তাঁর অনুসরণ করতে বলেছেন। নবীজি তাঁর সুন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত নেককাজ করতেও নিষেধ করেছেন। তাঁর সুন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত ইবাদতকে তিনি তাঁর তরীকা বহির্ভূত কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

'প্রিয় বন্ধুগণ! আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকো, তাহলে কস্মিনকালেও বিপথগামী হবে না। এর একটি আল্লাহর কিতাব, আর অপরটি তাঁর নবীর সুন্নাত।' (মুসতাদরাকে হাকিম)

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ.

'তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত অনুকরণ করে চলবে, আর মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। নতুন সৃষ্ট (মনগড়া) বিষয়াবলি থেকে নিজেদের দূরে রাখবে। কারণ এগুলো হলো বিদআত।' (মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৯৬)

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْ مَلٰئِكَةٌ إِلٰى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالُوْا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلًا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانِ فَقَالُوْا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهِ مَادِيَةٌ وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَادِيَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوْا أُوْلُو هَالِهِ يَفْقَهُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانِ فَقَالُوْا الدَّارُ الْجَنَّةَ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصٰى اللهَ وَمُحَمَّدًا فَرْقُ بَيْنَ النَّاسِ.

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন ফেরেশতা তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় গমন করেন। অতঃপর তারা বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের এ সাথির জন্য একটা উদাহরণ আছে, তাঁর জন্য উদাহরণ পেশ কর। তাদের কেউ বললেন, তিনি ঘুমাচ্ছেন। আবার কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত এবং তাঁর অন্তর জাগ্রত। অতঃপর তারা বললেন, তাঁর উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে একটা ঘর বানাল এবং সে সেখানে

খাবার তৈরি করল আর একজন আহ্বানকারী পাঠাল। সুতরাং যে আহ্বানকারীর আহ্বান গ্রহণ করবে, সে ঘরে প্রবেশ করবে এবং খাদ্য গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বান শুনবে না, সে ঘরে প্রবেশ করবে না এবং খাদ্যও গ্রহণ করবে না। অতঃপর তারা বললেন, এর ব্যাখ্যা করো, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তাদের কেউ বললেন, তিনি ঘুমাচ্ছেন। আবার তাদের কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত আর অন্তর জাগ্রত। তারপর তারা বললেন, ঘরটি হলো জান্নাত আর আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করলো, সে আল্লাহর নাফরমানি করলো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبٰى قِيْلَ مَنْ أَبٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبٰى.

'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যে ব্যক্তি আবা। বলা হলো—'আবা' কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার নাফরমানি করবে, সে আবা।' (বুখারী)

আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন,

يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيْ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَمَنْ أَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ.

'হে বৎস! যদি সম্ভব হয় তাহলে এভাবে জীবনযাপন করবে যে, কখনো তোমার অন্তরে কারো জন্য কোনো ধোঁকা বা অমঙ্গল কামনা থাকবে না। অতঃপর তিনি বলেন, বৎস! এটা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে, সে আমাকেই ভালোবাসবে। আর যে আমাকে ভালোবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।' (তিরমিযী)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا أَوْزَارَ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا.

'যদি কেউ আমার একটি সুন্নাতকে জীবিত করে এবং পুনর্জীবিত সুন্নাতের উপর মানুষ আমল করে, তাহলে যত মানুষ ওই সুন্নাতের উপর আমল করবে, তাদের সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব ওই ব্যক্তি পাবেন, এতে ওই সুন্নাতটির উপর আমলকারী ব্যক্তিদের সাওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো মানুষ কোনো বিদআত (অর্থাৎ দ্বীনের অংশ নয় এমন কোন নতুন বিষয়) উদ্ভাবন করে এবং মানুষ ওই বিদআতটির উপর আমল করে, তাহলে যত মানুষ ওই বিদআত কাজ করবে, তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ ওই ব্যক্তির আমলনামায় জমা হবে। এতে বিদআত কাজটি যারা করেছে, তাদের পাপে কোনো কমতি হবে না।' (ইবনে মাজাহ)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُرِدْنَ عَلَىٰ أَقْوَامٍ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يَحِلُّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ.

'আমার নিকট কিছু সম্প্রদায় আগমন করবে। আমি তাদেরকে চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। তখন আমি বলব, ওরা তো আমার লোক। আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, ওরা আপনার পরে কত বিদআত আবিষ্কার করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হও, দূর হও—যারা আমার পরে (আমার দ্বীন) পরিবর্তন করেছিলে।' (বুখারী)

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভে ধন্য সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেক সদস্যই আপন আপন স্থানে হিদায়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁদের জীবন ছিল সুন্নাত কেন্দ্রিক। তাঁদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতই ছিল একমাত্র আদর্শ ও সফলতার একমাত্র পথ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা, ভক্তি ও অনুসরণে তাঁরা ছিলেন আপসহীন ও অতুলনীয়। সুন্নাতের প্রতি তাঁদের এই অতুলনীয় আপসহীনতা আমরা দুই দিক থেকে পর্যালোচনা করতে পারি। প্রথম দিক হলো, জীবনের সকল দিকে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তাদের আপসহীনতা। জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁরা নবীজির অনুসরণ করতেন। দ্বিতীয়ত, ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রেও নবীজির অনুসরণের কোনো তুলনা হয় না।

এবার সাহাবীদের অতি সাধারণ জাগতিক বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের দুয়েকটি নমুনা পেশ করছি :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ فَمَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ اَهْلَكَهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.

> 'ইবনে উমর রা. বলেন, উমর ফারুক রা. কাবা শরীফ তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করে বলেন, আমি নিশ্চিতরূপেই জানি তুমি একটি পাথর মাত্র, কোনো কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা তোমার নেই। যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুম্বন না করতেন, তাহলে কখনই আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। এরপর তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তাওয়াফের সময় দৌড়ানোর আর কী প্রয়োজন? আমরা তো মুশরিকদের ভয় দেখানোর জন্য এভাবে তাওয়াফ করেছিলাম। আল্লাহ তো মুশরিকদের ধ্বংস করেছেন। এরপর তিনি বলেন, একটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, (কোনো যুক্তি না থাকলেও) আমরা তা পরিত্যাগ করতে চাই না। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতিতে দৌড়ে দৌড়ে তাওয়াফ করব।' (বুখারী)

হযরত ইবনে সিরীন রহ. বলেন, 'আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সাথে আরাফার ময়দানে ছিলাম। যখন তিনি তাঁর বাহন চালাতে আরম্ভ করলেন, আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। তিনি ইমামের কাছে এলেন এবং আমরা সকলে তাঁর সাথে জোহর ও আছরের নামায আদায় করলাম। এরপর ইমাম সন্ধ্যায় মুযদালিফার দিকে রওনা করলেন, আমরাও তাঁর সাথে রওনা করলাম। যখন আমরা মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থান 'মাদীকা' নামক জায়গায় পৌঁছলাম, তখন তিনি তাঁর বাহন থামালেন, আমরাও থামালাম। আমরা ধারণা করছিলাম তিনি এখানে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করবেন। তাঁর খাদেম বললেন, তিনি এখানে নামায পড়ার জন্য বিরতি করেননি; বরং যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথ দিয়ে চলার সময় এখানে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রয়োজন ছেড়ে এখানে বিরতি দিয়েছিলেন। তাই আমিও এখানে বিরতি দেওয়াকে পছন্দ করি।' (মুসনাদে আহমাদ)

সুবহানাল্লাহ! অতি সাধারণ বিষয়! তারপরও প্রিয় বন্ধুর অনুসরণ করতে নবীজির সাথিরা এতটুকু ভুল করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন,

‘একদিন এক দর্জি খাবার প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিলেন, আমিও নবীজির সঙ্গে ছিলাম। নবীজির সামনে রুটি, লাউ ও শুকনো নোনা গোশত রাখা হলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম খাঞ্চার ভেতর থেকে তিনি লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে নিচ্ছেন। আমি ওই দিন থেকে লাউকে বেশি পছন্দ করতাম।’

এখানে লক্ষ্যণীয়, পানাহারের রুচি সাধারণত একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। একজন অপরজনকে ভালোবাসলেও পানাহারের রুচিতে ভিন্নতা থেকে যায়। কিন্তু আনাস ইবনে মালেক রা.-এর কথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত বেশি ছিল যে, নবীজির ভালোবাসায় তাঁর ব্যক্তিগত রুচিও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এই ছিল সাহাবীদের ভক্তি ও ভালোবাসার নমুনা।

উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাগতিক অভ্যাস বা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা ইত্যাদি সুন্নাতকে অবজ্ঞা করেন বা এসব বিষয়ে কোনো সুন্নাত নেই বলে মনে করেন, তাদের এসকল ঘটনাগুলো চিন্তা করা দরকার। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাগতিক ও মানবীয় কাজগুলোও সুন্নাতের মর্যাদায় সমাসীন। তাঁর ইবাদতকে ইবাদত হিসেবে, জাগতিক অভ্যাসকে জাগতিক অভ্যাস হিসেবে অনুকরণ করাই ‘সুন্নাত’। এখানে কোনো যুক্তি বা মতামতের কিছু নেই। তবে এ কথাও সত্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুন্নাত অনুপকারী নয়।

সুন্নাতের বাইরে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য নয়

হাদীসে একদিকে সুন্নাতের অনুসরণকে যেমন নাজাতের একমাত্র উসিলা বলা হয়েছে, তেমনি সুন্নাতের অতিরিক্ত বা সুন্নাতের বাইরের কাজ থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। কোনো আমল সুন্নাতের অতিরিক্ত হলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে অপছন্দ করা বলে গণ্য হয়।

যে ব্যক্তি সুন্নাতের অতিরিক্ত নেক আমল করবে, সে ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে থাকবে না।

জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِيْ النَّارِ.

'নিশ্চয় সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে যাবে।' (নাসায়ী)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ

'আমাদের ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনত,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

'আমাদের কাজ যা নয়, এমন কোনো কাজ যদি কেউ করে, তাহলে তার কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না।' (মুসলিম)

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদআতির জন্য তওবার দরজা

বন্ধ করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তার বিদআত কাজ ত্যাগ করে।' (তাবরানী)

হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

'যে ব্যক্তি তার পিতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাকে লানত করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জবাই করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন। যে ব্যক্তি কোনো নব-উদ্ভাবন বা বিদআত প্রচলনকারীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন এবং যে ব্যক্তি জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে, আল্লাহ তাকেও লানত করেন।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلٰى هَدَمِ الْإِسْلَامِ

'যে ব্যক্তি কোনো বিদআতিকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংস সাধনে সাহায্য করল।' (বায়হাকী)

দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নাতসমূহ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সুন্নাতসমূহ

কানে আযান-ইকামত দেওয়া

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর (সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক) প্রথমে তাকে পরিষ্কার করিয়ে ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেবে। এ কাজটি সুন্নাত। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

তাহনীক করা

এরপর তাহনীক করাবে। এ আমলটিও সুন্নাত। তাহনীকের পদ্ধতি হলো, কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি দ্বারা খেজুর, মধু অথবা মিষ্টান্ন মুখে চিবিয়ে মুখ থেকে কিছু অংশ লালা সহকারে বের করে তা বাচ্চার মুখে দেবেন এবং বাচ্চার জন্য দোয়া করবেন। এটাকে তাহনীক বলে। (বুখারী)

ভালো নাম রাখা

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে তার জন্য সুন্দর নাম রাখা সুন্নাত। সর্বোত্তম নাম হলো আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান। এছাড়া নবী-রাসূলগণের নাম বা ভালো অর্থবহ নাম রাখা সুন্নাত। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, ‘কেয়ামতের দিন তোমাদের নাম ও তোমাদের পিতার নাম সহকারে ডাকা হবে। অতএব, তোমরা ভালো নাম রাখো।’ (আবু দাউদ)

খারাপ নাম থাকলে তা পরিবর্তন করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, হযরত উমর রা.-এর একটি কন্যার নাম ছিল عاصية ‘আসিয়াহ’ অর্থাৎ অবাধ্য নারী । রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম বদলে রাখলেন جميلة ‘জামীলাহ’ অর্থাৎ সুন্দরী। (মুসলিম)

আকীকা করা

সন্তানের বয়স সাত দিন হলে আকীকা করবে। এটি সুন্নাত। ছেলে হলে দুটি ছাগল এবং মেয়ে হলে একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করবে। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চৌদ্দতম দিন বা একুশতম দিনে করবে। তাও সম্ভব না হলে যখন সামর্থ্য হবে তখন করতে পারবে। তবে সামর্থ্য থাকলে সপ্তম দিনে করা উত্তম। পরবর্তীতে করলে জন্ম দিনের আগের দিন আকীকা করবে। যেমন জন্ম যদি শনিবার হয়ে থাকে, তাহলে আকীকা করবে শুক্রবারে। আর এমনটি করা মুস্তাহাব। (আবু দাউদ)

আকীকা দ্বারা সন্তান বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও বালা-মসিবত থেকে নিরাপদ থাকে। তাই আকীকার সুন্নাত পালন না করা হলে এগুলো থেকে নিরাপদ না-ও থাকতে পারে।

কথা বলতে শেখার পর কালিমা শিক্ষা দেওয়া

সন্তান যখন একটু একটু কথা বলতে শিখবে, তখন তাকে প্রথমে ঈমানের কালিমাগুলো শিক্ষা দেবে।

এরপর তার বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন তাকে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া সুন্নাত এবং নামাযের হুকুম দেওয়াও জরুরি। (আবু দাউদ)

দশ বছর বয়স হলে নামাযের আদেশ করা এবং প্রয়োজনে নামাযের জন্য লঘু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, যাতে নামাযের প্রতি গুরুত্ব দেয়। (আবু দাউদ)

দশ বছর বয়স হলে অবশ্যই তাদের বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। (আবু দাউদ)

খতনা করানো

খুব অল্প বয়সেই ছেলেকে খতনা করানো সুন্নাত। এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং অন্যান্য নবীগণেরও সুন্নাত। হযরত আম্মার

ইবনে ইয়াসির রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দশটি কাজ নবীগণের সুন্নাত। যথা :

১. মেসওয়াক করা।

২. অজুতে কুলি করা।

৩. নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।

৪. নখ কাটা।

৫. গোঁফ ছোট করা।

৬. দাড়ি লম্বা করা।

৭. বগলের লোম পরিষ্কার করা।

৮. নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা।

৯. খতনা করা।

১০. প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। (ইবনে মাজাহ)

পায়খানা- প্রস্রাবের সুন্নাত তরীকা

প্রস্রাব-পায়খানা করা প্রাকৃতিক প্রয়োজন হলেও এখানে কিছু নিয়মকানুন রয়েছে; যা মেনে চলা সবার জন্য জরুরি। যেমন :

১. জুতা-স্যান্ডেল পায়ে রাখা।

২. প্রস্রাব-পায়খানার সময় মাথা ঢেকে রাখা। বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দোয়া পড়া,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

৪. দোয়া পড়ার পর প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।

৫. যথাসম্ভব বসার নিকটবর্তী হয়ে সতর খোলা এবং কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে না বসা।

৬. বসে প্রস্রাব-পায়খানা করা। দাঁড়িয়ে কখনো প্রস্রাব-পায়খানা করবে না।

৭. প্রস্রাবের ছিটা ও পায়খানা থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা।

৮. ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করা।

৯. পানি খরচের পূর্বে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।

১০. শৌচাগার থেকে ডান পা দিয়ে বের হয়ে এই দোয়া পড়া,

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

১১. কখনো খোলা ময়দানে প্রস্রাব-পায়খানা করতে হলে কোনো কিছুর আড়ালে যাওয়া বা এমন দূরে যাওয়া—যাতে কারো দৃষ্টি না পড়ে। এ কাজগুলো সুন্নাত।

প্রস্রাব-পায়খানার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখাও জরুরি। যেমন :

১. মানুষের চলাচলের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা না করা।

২. ছায়াদার-ফলদার কোনো গাছের নিচে পেশাব-পায়খানা না করা।

৩. অজু-গোসলের স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৪. গর্তের ভেতরে পেশাব-পায়খানা না করা।

৫. কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৬. বিনা প্রয়োজনে পানিতে পেশাব-পায়খানা না করা।

৭. মসজিদের আঙিনায় বা ঈদগাহেও প্রস্রাব-পায়খানা না করা।

এছাড়া প্রস্রাব-পায়খানার সময় আল্লাহর নাম, নবী-রাসূলদের নাম, ফেরেশতাদের নাম, কোরআনের আয়াত, হাদীসের অংশ বা দোয়া-কালাম সম্বলিত কোনো জিনিস বহন না করা। পায়খানা-পেশাবের সময় কথা না বলা, জবানে যিকির না করা, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত না করা, সালাম না দেওয়া এবং সালামের উত্তরও না দেওয়া, মেসওয়াক না করা, পানাহার না করা।

মেসওয়াকের সুন্নাতসমূহ

মেসওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। মেসওয়াকের গুরুত্ব, ফযীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘আমি যদি আমার উম্মতের উপর

কষ্টের আশঙ্কা না করতাম, তবে প্রত্যেক নামাযের (অযুর) সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করে নেওয়া হয়, সে নামায বিনা মিসওয়াকে আদায়কৃত নামাযের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি মর্যাদা রাখে।' (বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নামাযের সময়ই মেসওয়াক করতেন না; বরং এটি ছিল তাঁর নিয়মিত একটি আমল। যাদুল মাআদ গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ রয়েছে যে, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জেগে মেসওয়াক করতেন। রাতে শয়নকালে মেসওয়াক করতেন। এটা ছিল তাঁর এক মহান অভ্যাস।'

মেসওয়াক করার সুন্নাত তরীকা হলো, প্রথমে উপরের ডান পাশের মাড়ির দাঁত থেকে মেসওয়াক আরম্ভ করবে। তারপর উপরের বাম পাশের মাড়ির দাঁতে মেসওয়াক করতে হবে। এরপর নিচের দাঁতগুলোতে মেসওয়াক করতে হবে। এভাবে প্রথমে একবার শুরু করে তারপর যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে মেসওয়াক করা যাবে। আর জিহ্বার উপরও মেসওয়াক করা উচিত। জিহ্বার উপর মেসওয়াক করলে পেটের রোগ দূর হয় এবং জবান পরিষ্কার হয়।

মেসওয়াক গাছের ডাল দ্বারা তৈরি করা সুন্নাত। মেসওয়াক পীলু বা যয়তুন গাছের ডাল হওয়া উত্তম। অন্যান্য গাছের ডাল দ্বারাও মেসওয়াক বানানো যায়।

দাঁত পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র সুন্নাত :

১. দাঁত পরিষ্কার করা।

২. দাঁত পরিষ্কারের জন্য গাছের ডাল ব্যবহার করা। ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজলে দাঁত পরিষ্কার করার সুন্নাত আদায় হয়; কিন্তু মেসওয়াক (অর্থাৎ গাছের ডাল) ব্যবহার করার সুন্নাত আদায় হয় না। উল্লেখ্য, কোনো সময় মেসওয়াক না পাওয়া গেলে তখন ব্রাশ বা আঙুল কিংবা কাপড় দ্বারা দাঁত মাজলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। (আল বাহরুর রায়েক : ১/২১)

অযুর সুন্নাত তরীকা

১. অযুর শুরুতে নিয়ত করা। অর্থাৎ পবিত্রতা লাভের জন্য অথবা নামায আদায়ের জন্য কিংবা কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য অযু করছি—এ মর্মে নিয়ত করা।

২. অযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়া সুন্নাত। অথবা এ দোয়া পড়ে অযু আরম্ভ করা,

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلَامِ

৩. অযুর অঙ্গগুলো ডান দিক থেকে ধুতে আরম্ভ করা।

৪. উভয় হাত পৃথকভাবে কবজিসহ তিনবার ধৌত করা।

৫. মেসওয়াক করা।

৬. তিনবার কুলি করা।

৭. নাকের নরম স্থানে তিনবার পানি পৌঁছানো।

৮. বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।

৯. সমস্ত মুখ তিনবার ধৌত করা।

১০. মুখ ধোয়ার সময় আঙুল দিয়ে দাঁড়ি খেলাল করা সুন্নাত।

১১. হাত-পা ধোয়ার সময় আঙুলগুলো খেলাল করা সুন্নাত। হাতের আঙুল খেলাল করার পদ্ধতি হলো, এক হাতের আঙুল আরেক হাতের আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া দিতে হবে। আর পায়ের আঙুল খেলাল করার পদ্ধতি হলো, বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল দ্বারা ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল পর্যন্ত খেলাল শেষ করবে।

১২. প্রত্যেকটা অঙ্গ তিনবার ধোয়া সুন্নাত এবং ডলে ডলে ধোয়া সুন্নাত।

১৩. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা এবং তা সামনের দিক থেকে আরম্ভ করা সুন্নাত। মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি হলো, উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙুলকে আলাদা করে বাকি তিন আঙুলের পেট দ্বারা মাথার উপরের অংশে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে টেনে আনতে হবে। তারপর দুই হাতের তালু মাথার পেছনের দিক থেকে

সামনের দিকে দুই পাশ দিয়ে টেনে আনতে হবে। এরপর শাহাদাত আঙুলের মাথা কানের লতিতে রেখে কানের ভাঁজে ভাঁজে উপরের দিকে ঘুরিয়ে আনতে হবে। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের পিঠের উপর মাসেহ করতে হবে। এরপর হাতের পূর্ণ পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসেহ করতে হবে। ঘাড় মাসেহ করার সময় দুই হাতের পিঠ শুধু ঘাড়ের উপর রেখে দিতে হবে। গলার দিকে বেশি টানা যাবে না।

১৪. ধারাবাহিকভাবে আঙুলগুলো ধোয়া। অর্থাৎ কোরআন-হাদীসে যে ধারাবাহিকতা উল্লেখ আছে, সেভাবেই অযু করা। যেমন প্রথমে কবজি পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া, এরপর কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, নাক পরিষ্কার করা, চেহারা ধোয়া, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া, মাথা মাসেহ করা, কান মাসেহ করা, গর্দান মাসেহ করা ও দুই পা ধোয়া।

১৫. সচল গতিতে অযু করা। অর্থাৎ এক অঙ্গ ধুয়ে আরেক অঙ্গ ধুতে দেরি না করা।

১৬. অযুর মাঝে এ দোয়া পড়া সুন্নাত,

اللّٰهُمَّ اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي

১৭. অযু শেষ করার পর কালেমায়ে শাহাদাত পড়া সুন্নাত। কালেমায়ে শাহাদাত হলো,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

১৮. কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার পর এই দোয়া পড়া,

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنِ

কোনো কোনো বর্ণনায় আকাশের দিকে তাকিয়ে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার কথা এসেছে।

গোসলের সুন্নাত তরীকা

জুমুআর নামাযের জন্য গোসল করা, দুই ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা, ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা এবং আরাফার ময়দানে অবস্থানের পূর্বে নামাযের গোসল করা সুন্নাত।

সর্বাবস্থায় গোসলের তরীকা হলো,

১. গোসলের পূর্বে প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে সেরে নেওয়া।

২. গোসলের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়া।

৩. গোসলের নিয়ত করা। অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করছি মর্মে নিয়ত করা।

৪. গোসলের শুরুতে উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নেওয়া।

৫. শরীর নাপাক থাকলে নাপাক স্থান তিনবার ধুয়ে নেওয়া। লজ্জাস্থান বাম হাত দ্বারা তিনবার ধুয়ে নেওয়া।

৬. গোসলের শুরুতে সুন্নাত তরীকায় অযু করে নেওয়া।

৭. তারপর মাথায় পানি ঢালা এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো।

৮. অতঃপর ডান কাঁধে পানি পৌঁছানো।

৯. তারপর বাম কাঁধে পানি ঢালা।

১০. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো।

১১. সবশেষে গোসলের জায়গায় যদি পানি জমে থাকে, তাহলে সেখান থেকে সরে দুই পা ধুয়ে নেওয়া। আর গোসলের জায়গায় পানি না জমলে সেখানে পা ধুয়ে নেওয়া।

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা

১. ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা।

২. মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া।

৩. তারপর যেকোনো দরূদ শরীফ পড়া।

৪. তারপর নিম্নের দোয়া পড়া,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উল্লেখিত এই তিনটি দোয়া একসাথে এভাবে পড়া যায়,

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

৫. মসজিদে ঢুকে ডান পাশে প্রথম কাতারে বসা। ডান পাশে জায়গা না থাকলে বাম পাশে বসা। প্রথম কাতারে জায়গা না থাকলে দ্বিতীয় কাতারে উক্ত নিয়মে বসা। অর্থাৎ সামনের কাতার ফাঁকা থাকলে পেছনের কাতারে না বসা।

৬. মসজিদে প্রবেশের পর এতেকাফের নিয়ত করা, প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা এবং নামায পড়া, কোরআন তেলাওয়াত করা ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকা।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা

১. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আগে বাম পা বের করে বাম পা জুতার উপর রাখা।

২. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়া।

৩. তারপর যেকোনো দরূদ শরীফ পড়া।

৪. তারপর এই দোয়া পড়া,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উল্লেখিত এই তিনটি দোয়া একসাথে এভাবে পড়া যায়,

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

৫. উক্ত দোয়া পড়ে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখবে এরপর ডান পা বের করে আগে জুতা পরবে।

আযানের সুন্নাত তরীকা

১. কিবলামুখী হয়ে আযান দেবে। আযানের শব্দগুলো ধীরেসুস্থে বলবে। প্রথমে দুই তাকবীর একদমে বলবে এবং প্রত্যেক তাকবীরের শেষে সাকীন করবে। তারপর ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ থেকে ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাক্য এক-এক দমে বলবে এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকীন করবে। শেষের দুই তাকবীর অর্থাৎ ‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার’ একদমে বলবে, কিন্তু উভয় তাকবীরের

শেষে সাকীন করবে। সর্বশেষে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একদমে বলে আযান শেষ করবে।

২. 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলার সময় ডান দিকে এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় বাম দিকে চেহারা ফেরাবে। কিন্তু বুক ও পা কিবলামুখী থাকবে।

আযানের জবাব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্তর থেকে (নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে) আযানের জবাব দেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম)

১. মুয়াজ্জিনের আযানের শব্দের ফাঁকে ফাঁকে হুবহু ওই শব্দগুলো বলে জবাব দেবে। তবে حي على الصلاة এবং حي على الفلاح বলার সময় لا حول ولا قوة إلا بالله বলবে। ফজরের আযানে الصلاة خير من النوم এর জবাবে صدقت وبررت বলবে। (মুসলিম)

২. অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যেকোনো দরূদ শরীফ পড়বে। (মুসলিম)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আযানের জবাব দেবে, অতঃপর আযান শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে, কেয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে। (বুখারী)

দোয়া হলো এই,

اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَاد.

ইকামত দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১. অযু অবস্থায় ইকামত দেবে।

২. কিবলামুখী হয়ে ইকামত দেবে এবং উভয় পায়ের মাঝে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁকা রাখবে ও পায়ের আঙুল কিবলামুখী করে রাখবে।

৩. ইকামতের শব্দগুলো বিরামহীনভাবে বলে যাবে। প্রথম চার তাকবীর একদমে বলবে এবং তাকবীরের শেষে সাকীন করবে। পরবর্তী বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে দুই দুই বাক্য একসাথে বলবে এবং শেষে সাকীন করবে। আর শেষের দুই দুই বাক্য একসাথে বলবে এবং শেষে সাকীন করবে। আর শেষের দুই তাকবীরের সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মিলিয়ে একদমে বলবে।

ইকামতের জবাব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

আযানের জবাবের মতো ইকামতের জবাব দেওয়াও সুন্নাত। তবে قد قامت الصلاة এর জবাবে أقامها الله وأدامها বলবে। (আবু দাউদ)

নামাযের একান্নটি সুন্নাত

দাঁড়ানো অবস্থায় **১১**টি সুন্নাত

১. উভয় পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা এবং দুই পায়ের মাঝে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা।

২. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় মাথা ও বুক পুরোপুরি সোজা রাখা এবং দৃষ্টি সিজদার দিকে রাখা।

৩. মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা ইমামের তাকবীরের সাথে সাথে বলা। তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, মুক্তাদীর তাকবীর ইমামের তাকবীরের আগে যেন শেষ না হয়। ইমামের তাকবীরের আগে মুক্তাদীর তাকবীর শেষ হলে মুক্তাদীর নামায হবে না।

৪. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো।

৫. হাত উঠানোর সময় উভয় হাতের তালু কিবলামুখী রাখা।

৬. হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিকভাবে রাখা। একেবারে মিলিয়ে না রাখা এবং বেশি খোলাও না রাখা।

৭. তাকবীরে তাহরীমার পর ডান হাতের তালু বাম হাতের পাতার(কবজির) পিঠের উপর রাখা।

৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কবজি ধরা।

৯. অবশিষ্ট তিন আঙুল বাম হাতের উপর স্বাভাবিকভাবে রাখা।

১০. নাভির নিচে হাত বাঁধা।

১১. সানা পড়া,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

কেরাতে ৭টি সুন্নাত

১. أَعُوْذُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া।

২. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া।

৩. সূরা ফাতেহার শেষে নিচু স্বরে আমীন বলা।

৪. ফজর ও যোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল অর্থাৎ সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বরূজ পর্যন্ত যেকোনো একটি সূরা পড়া। তবে জুমুআর দিন ফজরের নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ-লাম-মীম-সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর পড়া। আর আসর ও এশার নামাযে আওসাতে মুফাসসাল অর্থাৎ সূরা তারিক থেকে লাম-ইয়াকুন পর্যন্ত যেকোনো একটি সূরা পড়া। মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাসসাল অর্থাৎ সূরা লাম-ইয়াকুন থেকে সূরা নাস পর্যন্ত যেকোনো একটি সূরা পড়া।

৫. ফজরের প্রথম রাকাতের কেরাত দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে লম্বা হওয়া। অন্যান্য নামাযে উভয় রাকাতে কেরাত সমান পড়া সুন্নাত। ফজরের নামায ব্যতীত অন্য নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম রাকাতের চেয়ে কেরাত লম্বা পড়া খেলাফে সুন্নাত।

৬. কেরাত মধ্যম গতিতে পড়া। খুব বেশি তাড়াতাড়িও নয়, আবার খুব ধীরেও নয়।

৭. প্রত্যেক ফরয নামাযে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত।

রুকুতে ৮টি সুন্নাত

১. তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাওয়া।

নিয়ম হলো, যখন রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন 'আল্লাহু' বলার

সাথে সাথে রুকুতে ঝুঁকা শুরু করবে এবং 'আকবার' শব্দের 'বার' বলার সাথে সাথে পূর্ণ রুকুতে যাবে।

২. পুরুষের জন্য উভয় হাতের আঙুল দ্বারা হাঁটু ধরা। (মহিলাদের জন্য মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে হাতের আঙুলসমূহের মাথা হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছানো এবং হাত শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখা।)

৩. রুকু অবস্থায় হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে রাখা।

৪. উভয় হাত সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না রাখা।

৫. পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা। হাঁটু সামনে বা পেছনে বাঁকা না করা।

৬. মাথা, পিঠ, নিতম্ব ও কোমর সোজা রাখা এবং পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখা।

৭. রুকুতে গিয়ে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া।

৮. জামাতে নামায পড়লে ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ আর মুক্তাদী শুধু رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। এবং একাকী নামাযে উভয়টি পড়া।

সিজদায় ১২টি সুন্নাত

১. তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া। এর নিয়ম হলো, সিজদায় যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা শুরু করবে এবং সিজদায় যাওয়া শেষ এমতাবস্থায় 'আকবার' শব্দের 'বার' বলা শেষ হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাকবীর বেশি দীর্ঘ না হয়। যেখানে যতটুকু টান আছে, সেখানে ততটুকু টেনে তাকবীর দেবে। সিজদায় যাওয়ার সময় বুক সোজা রেখে নিচের দিকে যেতে হবে।

২. প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।

৩. সিজদার জন্য হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত দূরে কান বরাবর উভয় হাত রাখা। এর নিয়ম হলো, সিজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাতকে কান বরাবর এভাবে রাখতে হবে, যাতে হাতের তালু কান বরাবর হয় এবং মাথা যেন কান (হাত)থেকে বেশি ফাঁকা না হয়।

৪. তারপর বৃদ্ধাঙ্গুল বরাবর নাক রাখা।

৫. তারপর কপাল রাখা।

৬. উভয় হাতের মাঝে সিজদা করা এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে রাখা।
৭. সিজদার সময় পেটকে উরু থেকে আলাদা রাখা।
৮. উভয় পাঁজর থেকে উভয় বাহু আলাদা রাখা।
৯. উভয় হাতের কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে পৃথক রাখা।
১০. সিজদায় কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া।
১১. সিজদার থেকে উঠার সময় তাকবীর বলা।
১২. সিজদার থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাঁটু উঠানো।

নামাযের বৈঠকে ১৩টি সুন্নাত

১. বসার সময় ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা। উভয় পায়ের আঙুলগুলো যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
২. উভয় হাতের আঙুল রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং দৃষ্টি রানের উপর রাখা।
৩. আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় 'আশহাদু' বলার সাথে সাথে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙুলের মাথা একসাথে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রাখা। 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙুল উঁচু করে ইশারা করা। তবে খাড়া না করা বরং উঁচু করে সমতল রাখা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় আঙুলের মাথা সামান্য ঝুকিয়ে রাখা।
৪. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়া।
৫. দরূদ শরীফ পড়ার পর দোয়া মাসূরা পড়া।
৬. উভয় দিকে সালাম ফেরানো।
৭. সালাম ফেরানোর সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখা। সালাম ফেরানোর পদ্ধতি হলো, চেহারা কিবলার দিকে মুখ করে রেখে السلام عليكم বলা এবং ورحمة الله বলার সময় ডান দিকে চেহারা ঘুরানো।
৮. ইমাম সালাম ফেরানোর সময় মুক্তাদী, ফেরেশতা ও নামাযী জীনদের নিয়ত করা।

৯. মুক্তাদীগণ সালাম ফেরানোর সময় ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জীনদের প্রতি সালামের নিয়ত করা।

১০. একাকী নামাযী ব্যক্তির জন্য শুধু ফেরেশতাগনের প্রতি সালামের নিয়ত করা।

১১. মুক্তাদী ইমামের সাথে সাথে সালাম ফেরানো।

১২. দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালামের চেয়ে আস্তে বলা এবং প্রথম সালাম ফেরানোর পর চেহারা আবার কিবলামুখী করে দ্বিতীয় সালাম ফেরানো।

১৩. ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফেরানোর পর মাসবুক অর্থাৎ যার এক বা একাধিক রাকাত ছুটে গেছে, সে ছুটে যাওয়া নামাযের জন্য দাঁড়াবে।

জুমুআর দিনের সুন্নাতসমূহ

নিম্নে লিখিত সুন্নাতগুলোর উপর জুমুআর দিন আমল করলে প্রতি কদমে এক বছরের নফল নামায ও এক বছরের নফল রোযার সাওয়াব পাওয়া যায় :

১. জুমুআর আগে সুন্নাত মোতাবেক গোসল করা, মেসওয়াক করা।

২. উত্তম ও পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা, আতর লাগানো।

৩. আযান হোক বা না হোক, আগে আগে মসজিদে যাওয়া।

৪. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।

৫. মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের নিকটে বসার চেষ্টা করা। (যদি অন্য মুসল্লীদের কষ্ট না হয়।)

৬. মনোযোগ সহকারে ইমামের খুতবা শোনা।

৭. খুতবার সময় অহেতুক কোনো কাজ না করা বা কথা না বলা।

৮. জুমুআর জামাতের পূর্বে এক সালামে চার রাকাত সুন্নাত পড়া ও জুমুআর নামাযের পর চার রাকাত সুন্নাত পড়া।

খুতবার সুন্নাতসমূহ

১. অযু অবস্থায় খুতবা দেওয়া।

২. সুন্নাতী পোশাক পরিধান করা।
৩. খুতবা আরম্ভ করার পূর্বে খতীব মিম্বারে বসা।
৪. মুয়াজ্জিন খতীবের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া।
৫. দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া।
৬. মুসল্লীগণ আগ্রহী হয়ে খতীবের দিকে মুখ করে বসা।
৭. আরবী ভাষায় খুতবা দেওয়া।
৮. পরপর দুই খুতবা দেওয়া।
৯. খুতবা শুরু করার আগে আস্তে আস্তে আউযুবিল্লাহ পড়া।
১০. উচ্চ স্বরে খুতবা পড়া।
১১. খুতবার মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয় উল্লেখ করা :
    ক. আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা।
    খ. আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা।
    গ. তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া।
    ঘ. দরূদ শরীফ পড়া।
    ঙ. মুসল্লীদের নসীহত করা।
    চ. কোরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা।
১২. দ্বিতীয় খুতবায় উল্লেখিত বিষয়গুলো পুনরাবৃত্তি করা।
১৩. দুই খুতবার মাঝে সামান্য সময় বসা।
১৪. দ্বিতীয় খুতবায় মুমিন মুসলমানের জন্য দোয়া করা।
১৫. খুতবা সাধারণত বড় করা।

ঈদুল ফিতরের সুন্নাতসমূহ

১. খুব সকালে ঘুম থেকে উঠা।
২. ফজরের নামায নিজ মহল্লার মসজিদে পড়া।
৩. মেসওয়াক করা।

৪. সুন্নাত তরীকায় গোসল করা।
৫. সাধ্যমত উত্তম কাপড় পরা।
৬. আতর-খুশবু লাগানো।
৭. শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে সাধ্যমতো সুসজ্জিত হওয়া।
৮. ঈদগাহে যাওয়ার আগে কোনো মিষ্টিদ্রব্য খাওয়া।
৯. আগে আগে ঈদগাহে যাওয়া।
১০. ঈদগাহে যাওয়ার আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা।
১১. শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে সাধ্যমতো আনন্দ প্রকাশ করা।
১২. ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।
১৩. ঈদের নামায মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে পড়া।
১৪. ঈদগাহে যাওয়ার সময় নিম্নস্বরে এ তাকবীর বলা ও ঈদগাহে যাওয়ার পর তাকবীর বন্ধ করা :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

১৫. ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা।

ঈদুল আযহার সুন্নাতসমূহ

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সুন্নাত প্রায় একই, তবে সামান্য পার্থক্য রয়েছে :

১. ঈদুল ফিতরে কোনো মিষ্টিদ্রব্য খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া, আর ঈদুল আযহায় কিছু না খেয়ে যাওয়া সুন্নাত।
২. ঈদুল ফিতরের দিন আস্তে আস্তে তাকবীর বলা সুন্নাত, কিন্তু ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যাওয়ার সময় ও ফেরার পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা সুন্নাত।
৩. ঈদুল আযহার নামায ঈদুল ফিতরের নামাযের চেয়ে আগে পড়া সুন্নাত।
৪. ঈদুল ফিতরের নামাযের আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা সুন্নাত, পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন সক্ষম ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব।

যাকাত প্রদানের সুন্নাত তরীকা

১. যাকাত ফরয হওয়ার সাথে সাথে হকদারদের নিকট পৌঁছে দেওয়া উচিত। বর্তমানে আমাদের দেশে দাতাগণ নিজ গদিতে বসে থাকেন, আর গরিব-মিসকীনরা দিনের পর দিন লাইনে বা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, এটা অনুচিত।

২. গরিব মিসকীনদেরকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করতে হবে অথবা যাকাতের সম্পদ পৃথক করার সময় যদি যাকাতের নিয়ত করে থাকে, তবে সে সম্পদ গরিবদের দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৩. যদি গরিবকে কোনো নিয়ত ছাড়াই সম্পদ প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে উক্ত সম্পদ ওই গরীবের হাতে থাকাবস্থায় যাকাতের নিয়ত করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৪. যাকাত ওই সমস্ত লোকদের দেওয়া যাবে, যাদের কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। যাকাত প্রদানকারীর জন্মগত সম্পর্ক যাদের সাথে রয়েছে, যেমন মাতা-পিতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, এমনিভাবে উপরের দিকে এবং ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি এমনিভাবে নিচের দিকের লোকদের যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। অনুরূপ স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। বিধর্মীকেও যাকাত দেওয়া জায়েয নেই।

৫. যাকাত পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য হলো নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা যাকাত পাওয়ার হকদার। দ্বীনি ইলম অর্জনকারী তালিবুল ইলম ও শিক্ষক যদি যাকাতের হকদার হয়, তাহলে তাদের যাকাত দেওয়াও উত্তম।

রোযার সুন্নাতসমূহ

১. সাহরী খাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাহরীতে বরকত রয়েছে। তাই তোমরা কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিও না। কিছু না পেলে সামান্য পানি হলেও পান করো। কারণ যারা সাহরী খায়, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতারাও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। (মুসনাদে আহমদ)

২. ইফতার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে বান্দা ইফতারের সময় হওয়া মাত্র ইফতার করে, সে আমার নিকট খুবই প্রিয়। (বুখারী)

৩. ইফতারের সময় দোয়া পড়া সুন্নাত। (আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্যই রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারাই ইফতার করছি।'

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের কোনো দোয়া (কবুল করা ছাড়া) ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (মুসনাদে আহমাদ)

৬. তারাবী পড়া। পূর্ণ রমযান মাস তারাবী পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা।

৭. তারাবী বিশ রাকাত পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা।

৮. তারাবী জামাতে পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কেফায়া।

৯. তারাবী দুই দুই রাকাত করে দশ সালামে বিশ রাকাত পড়া সুন্নাত।

১০. রমযান মাসে তারাবীর মধ্যে এক খতম কোরআন শরীফ পড়া বা শোনা সুন্নাতে মুআক্কাদা।

১১. ইতেকাফ করা। রমযানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কেফায়া।

হজের সুন্নাতসমূহ

১. এহরামের সময় গোসল বা অযু করা।

২. দুটি নতুন বা পরিষ্কার সাদা কাপড় পরা।

৩. এহরামের নিয়ত করার পর দু-রাকাত নামায পড়া।

৪. মক্কাবাসী ব্যতীত অন্য লোকদের তাওয়াফে কুদূম করা (হজ্বে ইফরাদ বা হজ্বে কিরানের জন্য)।

৫. তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্কর রমল করা। আর তাওয়াফে কুদূমে রমল না করলে তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করা।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে কুদূমের পর সাঈ করতে হবে, নতুবা তাওয়াফে কুদূমে রমল করা সত্ত্বেও আবার তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করতে হবে।

৬. তাওয়াফ করার সময় দ্রুত চলা।

৭. প্রতি চক্করের শেষে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

৮. সাফা মারওয়ায় সাঈ করার সময় দ্রুত চলা।

৯. ৮ই যিলহজ মক্কা থেকে মিনায় গিয়ে জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া এবং রাতে মিনায় অবস্থান করা।

১০. ৯ই যিলহজ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার ময়দানে রওনা হওয়া।

১১. উকূফে আরাফার পর সেখান থেকে সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে রওনা হওয়া।

১২. ৯ই যিলহজ মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

১৩. উকূফে আরাফার জন্য সেদিন যোহরের পূর্বে গোসল করা।

১৪. ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ দিবাগত রাতগুলোতে মিনায় থাকা।

১৫. মিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে মুহাস্‌সাব নামক স্থানে কিছুসময় অবস্থান করা।

খানা খাওয়ার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাওয়ার পূর্বে দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন। (ইবনে মাজাহ)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খাওয়ার সময় তিন তরীকার যেকোনো এক তরীকায় বসতেন। (মাওয়াহেবে লাদুনিয়াহ)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়ার টেবিলে বসে খানা খাননি। (বুখারী)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের জন্য সবসময় ডান হাত ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো একা খেতেন না, একাধিক লোক নিয়ে খাবার খেতেন। (মুসনাদে আহমদ)

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাবারের প্রশংসা বা নিন্দা করতেন না। কারণ প্রশংসায় লোভ এসে যায়। আর নিন্দা করতেন না এজন্য যে, খাবার আল্লাহ তাআলার একটা নেয়ামত। (বুখারী)

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খেতেন। (বুখারী)

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম লোকমা গ্রহণের সময় এই দোয়া পড়তেন,

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়তেন। নবীজি বলতেন, যে নেয়ামতের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা হয়, সে নেয়ামতের হিসাব নেওয়া হয় না।

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে এ দোয়া পড়তেন,

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সামনে থেকে খাবার খাওয়া আরম্ভ করতেন এবং পাত্রের মাঝে হাত দিতে বারণ করতেন আর বলতেন, খাবারের মাঝে বরকত থাকে। (বুখারী)

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে আঙুল চেটে খেতেন এবং ইরশাদ করতেন, আঙুল চেটে খাও, কেননা জানা নেই খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দস্তরখানে অথবা পেয়ালা থেকে পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খেতেন এবং বলতেন, পড়ে যাওয়া খাবার শয়তানের জন্য ছেড়ে দিয়ো না। (মুসলিম)

১৪. অন্য এক হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে অভাব অনটন, ধবল ও

কুষ্ঠরোগ থেকে রক্ষা করবেন। তার সন্তানদেরকে নেককার বানাবেন। তাকে নির্বুদ্ধিতা থেকে হেফাজত করবেন এবং তাকে সকল মুসিবত থেকে মুক্তি দিবেন। (মাদারেজুন নবুওয়াহ)

১৫. মজলিসে উপস্থিত মুরুব্বিকে দিয়ে খাবার শুরু করানো সুন্নাত। (মুসলিম)

১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি হেলান দিয়ে বা হাতে ভর দিয়ে খাবার খাই না। সুতরাং তোমরাও হেলান দিয়ে খাবার খেয়ো না। (বুখারী)

১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরিহিত ব্যক্তিকে জুতা খুলে খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিতেন। (ইবনে মাজাহ)

১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খাওয়ার সাথে সাথে পানি পান করতেন না; বরং কিছুক্ষণ পরে পান করতেন। (মাদারেজুন নবুওয়াহ)

২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খেয়েই শুয়ে পড়তে নিষেধ করতেন। (যাদুল মাআদ)

২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার শেষে এই দোয়া পড়াতেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

২২. অন্যের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বেশি প্রয়োজন না হলে) উঠতেন না। (ইবনে মাজাহ)

২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দস্তরখানা তুলে নেওয়ার আগে আহারকারী উঠবে না। (ইবনে মাজাহ)

২৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের শেষে উভয় হাত ধুতেন এবং কুলি করতেন। (আবু দাউদ)

২৫. দাওয়াতে আহার শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন,

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِيْ

পান করার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন পান করবে তখন ডান হাতে পান করবে। (আবু দাউদ)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন (তবে জমজমের পানি ও অযুর অবশিষ্ট পানি এ হুকুমের বহির্ভূত)। (বুখারী)

৩. বিসমিল্লাহ বলে পান করা এবং পানের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা। (আবু দাউদ)

৪. কমপক্ষে তিন শ্বাসে পানি পান করা এবং পানপাত্রে শ্বাস না ফেলা ও ফুৎকার না দেওয়া। (মুসলিম)

৫. বালতি, কলস, জগ ইত্যাদি বড় পাত্র থেকে সরাসরি মুখ লাগিয়ে পান করা। (বুখারী)

৬. পানীয় দ্রব্য পান করে পাশের কাউকে দিতে হলে আগে ডান দিকের ব্যক্তিকে দিতে হবে। (তিরমিযী)

৭. যিনি পান করাবেন, তিনি সবার শেষে পান করবেন। (মুসলিম)

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুষে চুষে ও গড়গড় করে পান করতে নিষেধ করেছেন। (মাদারেজুন নবুওয়াহ)

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার পর এ দোয়া পড়তেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوْبِنَا مِلْحًا أُجَاجًا.

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরচর্চার পর ক্লান্ত অবস্থায় খাদ্য অথবা ফল খাওয়া কিংবা গোসলের পর পানি পান করাকে ভালো মনে করতেন না। (যাদুল মাআদ)

১১. জমজমের পানি পান করার দোয়া :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

১২. কোনো ফল খাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়তে আদেশ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا
وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا-

ঘুমানোর সুন্নাত তরীকা

১. অযু অবস্থায় ঘুমানো সুন্নাত। (যাদুল মাআদ)

২. শোয়ার আগে কাপড় দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেওয়া সুন্নাত। (তিরমিযী)

৩. শোয়ার আগে কাপড় পরিবর্তন করা সুন্নাত। (যাদুল মাআদ)

৪. শোয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলে নিম্নের কাজগুলো সুন্নাত :

ক. ঘরের দরজা বন্ধ করা।

খ. বাতি নিভিয়ে দেওয়া।

গ. খাবারের পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা।

ঘ. ঢাকার জন্য কিছু না পেলে অন্তত বিসমিল্লাহ বলে একটি কাঠি রেখে দিলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নিঃসন্দেহে আগুন তোমাদের শত্রু। তাই ঘুমানোর সময় আগুন নিভিয়ে নেবে।' (বুখারী)

৫. এশার নামাযের পরে অযথা গল্পগুজব না করে শুয়ে যাওয়া। তবে ওয়াজ-নসীহত, কিতাব অধ্যয়ন ও ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য জাগ্রত থাকায় অসুবিধা নেই।

৬. শোয়ার আগে তিনবার করে উভয় চোখে সুরমা দেওয়া সুন্নাত। (বুখারী)

৭. ঘুমানোর আগে কমপক্ষে কোরআনের ১০টি আয়াত তেলাওয়াত করা। এতে পূর্ণ রাত ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যাবে।

৮. যে ব্যক্তি শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে, সে তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদে রাখবে। (বুখারী)

৯. হযরত ফাতেমা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন খাদেমের আবেদন করলে তিনি বললেন, শোয়ার সময় ৩৩ বার

سُبْحَانَ اللهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرْ পড়বে। তাহলে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং এটা খাদেম অপেক্ষা অনেক উত্তম। (মুসলিম)

১০. ঘুমানোর সময় ডান পাশে কেবলামুখী হয়ে ঘুমানো সুন্নাত। (বুখারী)

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতে গেলে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন। উভয় হাতকে একত্রিত করে ফুঁক দিতেন এবং হাতদ্বয় সমস্ত শরীরে যতদূর সম্ভব বুলিয়ে নিতেন। এভাবে তিনবার করতেন। (বুখারী)

১২. হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন, তখন ডান হাত মাথার ডান পার্শ্বের নিচে রেখে নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَ

১৩. হযরত আলকামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে ঘুমানোর সময় পড়বে, এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (বুখারী)

১৪. খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখলে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে তিনটি কাজ করতে হবে :

ক. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়তে হবে।

খ. বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলতে হবে।

গ. পার্শ্ব বদলে শুতে হবে। (বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ)

ঘুম থেকে উঠার পর সুন্নাতসমূহ

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দুই হাতের তালু দ্বারা চেহারা ও চোখ ভালোভাবে ডলে নেওয়া, যাতে ঘুমের ভাব দূর হয়ে যায়। (শামায়েলে তিরমিযী)

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা এবং কালিমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

৩. জাগ্রত হওয়ার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে দরজা খোলা। বাম পা দিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া এবং বের হওয়ার সময় নিম্নের দোয়া পড়া,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

৪. ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করা। (যাদুল মাআদ)

৫. ঘুম থেকে উঠার পর দুই হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া। (অতঃপর অন্যান্য কাজ করা।)

পোশাক-পরিচ্ছদের সুন্নাতসমূহ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গি সাড়ে চার হাত লম্বা এবং সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত ছিল। (শামায়েল)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গি সাদা রঙের ছিল, তিনি সাদা পোশাক পছন্দ করতেন। (বুখারী)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গির সামনের দিক কিছুটা ঝুলন্ত থাকত এবং পেছনের দিক সামান্য উঁচু থাকত। (মাদারেজুন নবুওয়াহ)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি সর্বদা অর্ধনলা বরাবর রাখতেন। (আবু দাউদ)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন জুমুআর দিন থেকে আরম্ভ করতেন। (যাদুল মাআদ)

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাপড় পরিধান করতেন, তখন পোশাকের নাম নিয়ে এ দোয়া পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ
وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

পায়জামা পরিধান করার সুন্নাত তরীকা

১. পায়জামা বসে পরিধান করতে হয়, কেননা পায়জামা দাঁড়িয়ে পরলে স্মরণশক্তি কমে যায় এবং দারিদ্র্য আসে। (যারকানী)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক থেকে কাপড় পরা আরম্ভ করতেন। (নাসায়ী)

জামা পরিধান করার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত সুতি কাপড়ের জামা পরিধান করতেন এবং তাতে বুক বরাবর ফাড়া ও বোতাম লাগানো থাকত। (শামায়েল)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামা মুবারক পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত লম্বা ছিল। (ইবনে মাজাহ)

৩. হযরত আসমা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার আস্তিন হাতের কবজি পর্যন্ত হতো। (মুজামুত তাবরানী)

টুপি পরার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা টুপি পরিধান করতেন।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা কাপড়ের এমন টুপি পরিধান করতেন, যা মাথার সাথে লেগে থাকত।

৩. পাগড়ীর নিচে টুপি পরিধান করা সুন্নাত। (তিরমিযী)

জুতা পরিধানের সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলতেন, এরপর ডান পায়ের।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি বসতে চায়, সে যেন জুতা খুলে বাম পাশে রেখে বসে। এটা নবীজির সুন্নাত। (আবু দাউদ)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জুতা উঠাতেন, তখন বাম হাতে উঠাতেন। (শামায়েল)

চুল, নখ, গোঁফ ইত্যাদি কাটার সুন্নাত তরীকা

১. সপ্তাহে একবার নখ কাটা সুন্নাত এবং জুমআর নামাযের আগে নখ কাটা সুন্নাত।

২. হাতের নখ কাটার সুন্নাত তরীকা হলো, উভয় হাত মুনাজাতের আকৃতিকে ধরে ডান হাতের শাহাদাত আঙুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কাটতে কাটতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ পর্যন্ত কেটে শেষ করা। অতঃপর সর্বশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটা।

৩. পায়ের নখ কাটার সুন্নাত তরীকা হলো, ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ পর্যন্ত কেটে শেষ করা।

৪. মহিলাদের নখে মেহেদি লাগানো সুন্নাত।

চুলের সুন্নাত

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় বাবরি চুল রাখতেন। তাঁর বাবরি চুল কাধের মধ্যভাগ পর্যন্ত হতো। আবার কখনো কখনো কানের লতি পর্যন্ত হতো।

২. বাবরি চুল রাখা অথবা মুণ্ডানো সুন্নাত। কিছু অংশ মুন্ডানো আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া সঠিক নয়। (বুখারী, মুসলিম)

দাড়ি ও গোঁফের সুন্নাত

১. দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কাটা বা এক মুষ্টির চেয়ে বেশি ছাটা হারাম ও কবীরা গোনাহ। (বুখারী)

২. দাড়ি এক মুষ্টি বা তার চেয়ে বড় রাখা সুন্নাত। দাড়ি লম্বা করা ও গোঁফ ছোট করা সুন্নাত। (বুখারী)

৩. দাড়ি সাদা হলে মেহেদি লাগানো অথবা সাদা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উভয়টি সুন্নাত। (শামায়েল)

৪. গোঁফ ভালোভাবে ছাটা সুন্নাত। (বুখারী)

৫. গোঁফ মুণ্ডন করা মাকরূহ।

৬. গোঁফ এমনভাবে ছোট করে রাখা, যাতে উপরের ঠোঁটের লাল অংশ দেখা যায়—এমনটি করা সুন্নাত। (আবু দাউদ)

বিয়ে-শাদির সুন্নাত তরীকা

১. বিয়ের ক্ষেত্রে সুন্নাত তরীকা হলো, কোনো মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করলে প্রথমেই তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না; বরং তাদের দ্বীনদারী ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পর এস্তেখারা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণের ফায়সালা করে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কোনো কাজ করার আগে এস্তেখারা করার জন্য খুব তাগিদ দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণের জন্য দোয়া না করা অকল্যাণের আলামত।

২. দ্বীনদার পরহেজগার পাত্রী দেখে বিয়ে করা সুন্নাত। শুধু সুন্দরী ও সম্পদশালী হওয়ার দিকটা অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়। (বুখারী)

৩. পাত্রপাত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে পয়গাম পাঠানো সুন্নাত। (মেশকাত)

৪. যে বিয়ের খরচ কম হয় এবং মোহর সামান্য হয়, সে বিয়েতে বরকত বেশি। (মেশকাত)

৫. জুমুআর দিন বিয়ে করা সুন্নাত এবং মসজিদে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সুন্নাত। (তিরমিযী)

৭. বিয়ের মজলিসে খেজুর ছিটানো সুন্নাত। (তিরমিযী)

৮. স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পর ওলিমা খাওয়ানো সুন্নাত। (তিরমিযী)

৯. বিয়ের আগে মেয়েকে ছেলের দেখে নেওয়া সুন্নাত। (তিরমিযী)

১০. কোনো মেয়ে বা ছেলের যদি কোথাও বিয়ের আলোচনা চলতে থাকে, তখন কোনো এক পক্ষ থেকে উত্তর না দেওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। (বুখারী)

বিয়ে পড়ানোর সুন্নাত তরীকা

১. ইজাব কবুল বিয়ের জন্য আবশ্যক। এ দুটি দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ বিয়ের আগে মেয়ে থেকে মেয়ের অভিভাবক অনুমতি নিয়ে

নেবেন। অনুমতি আনার সময় মেয়েকে ছেলের বিস্তারিত পরিচয় দিতে হবে এবং মহরের টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে তাতে সে রাজি কি না তা জানতে হবে। মেয়ে যদি কুমারী হয়, আর চুপ থাকে তাহলে অনুমতি হয়ে যাবে। এভাবে অনুমতি এনে তিনি নিজে বা অন্য কাউকে ওকীল বানিয়ে ছেলে থেকে কবুল গ্রহণ করবেন।

২. বিয়ের জন্য খুতবা পড়া সুন্নাত।

৩. যখন বিয়ে হয়ে যাবে, তখন বর ও কনের জন্য এ দোয়া পড়া সুন্নাত,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

স্বামী স্ত্রীর গোপনীয় কিছু কাজ

১. বিয়ের পর যখন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রথমে তার কপালের চুল ধরে এই দোয়া পড়া সুন্নাত,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

২. বাসর রাতে বরের পক্ষ থেকে কনেকে কিছু হাদিয়া দেওয়া সুন্নাত।

৩. স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করা সুন্নাত। (তিরমিযী)

৪. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গোপনীয় বিষয় অপরের কাছে বর্ণনা করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। (তিরমিযী)

৫. স্ত্রী-সহবাসের পূর্বে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে। অন্যথায় শয়তানের বীর্য স্বামীর বীর্যের সাথে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, যার দ্বারা সন্তান শয়তানের স্বভাববিশিষ্ট হয়। (বুখারী)

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا

৬. একবার স্ত্রী-সহবাসের পর পুনরায় স্ত্রী-সহবাসের ইচ্ছা করলে গোসল করে নেওয়া উত্তম। তবে অযু করে নিলেও হবে। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

৭. নাপাক শরীরে কোনো কিছু খেতে হলে প্রথমে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধুয়ে গড়গড়াসহ কুলি করে নেওয়া উচিত। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

৮. হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। তবে এ অবস্থায় নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত অংশটুকু ছাড়া বাকি অঙ্গ ব্যবহার করা জায়েয।

৯. অনেক দিন পর বাড়িতে এলে সাথে সাথে বাড়িতে না যাওয়া; বরং একটু বিলম্ব করে প্রবেশ করা, যাতে স্ত্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সাজসজ্জা করে নেওয়ার সুযোগ পায়। কেননা হতে পারে স্ত্রী এমন অবস্থায় আছে, যে অবস্থায় দেখলে স্বামীর অনাগ্রহ সৃষ্টি হবে। (তবে এখন যেহেতু যোগাযোগব্যবস্থা খুবই উন্নত, তাই মোবাইলের মাধ্যমে এ খবর আগেই দেওয়া যায়।) (আবু দাউদ)

দাম্পত্য জীবন পরিচালনার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে নারীই উত্তম, যাকে দেখলে স্বামীর মন আনন্দ পায়। যে নারী স্বামী (শরীয়ত মোতাবেক) যা আদেশ দেয়, তা পালন করে আর নিজের সতীত্ব ও ধন সম্পদ হেফাজত করে।

২. এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীদের নির্দেশ দিতাম তারা যেন নিজ স্বামীকে সিজদা করে। (তিরমিযী)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং তাদের নেকি আকাশে উঠে না : ক. পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না সে তার মনিবের হাতে ধরা দেয়। খ. ওই নারী, যার উপর তার স্বামী নারাজ, যতক্ষণ না সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। গ. মাতাল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে হুশে ফিরে আসে।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে স্ত্রী তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

৫. স্বামীর আনুগত্য ও খেদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পর স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারই সবচেয়ে বেশি। তবে কোনো পাপ কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে না।

৬. স্ত্রী স্বামীর নিকট তার সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু দাবি করবে না।

৭. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী ঘর থেকে বের হবে না।

৮. স্বামীর অর্থ-সম্পদ হেফাজত করা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৯. স্বামী শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য ডাকলে স্ত্রীর জন্য সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তবে স্ত্রীর শরীয়তসম্মত আপত্তি থাকলে ভিন্ন কথা।

১০. স্বামীর মধ্যে শরীয়তের খেলাফ কিছু দেখলে আদবের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করবে এবং স্বামীকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা করবে।

১১. স্বামীকে খুশি করার জন্য সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে থাকা স্ত্রীর কর্তব্য। এটা স্বামীর অধিকার।

১২. স্বামী সফর থেকে বা বাইরে থেকে কাজকর্ম করে এলে খোঁজখবর নেওয়া আবশ্যক।

১৩. সর্বাবস্থায় স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করা আবশ্যক।

১৪. হযরত হাকীম ইবনে যুয়াবিরা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার উপর উপর স্ত্রীর হক কী?' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ক. তুমি যেমন খাও, তাকেও তেমনই খাবার খাওয়াবে।

খ. তুমি যেমন কাপড় পরো, তাকেও তেমন কাপড় পরাবে।

গ. তাকে প্রহার করবে না।

ঘ. তাকে গালমন্দ করবে না।

ঙ. তার সঙ্গে মেলামেশা ত্যাগ করবে না। অর্থাৎ রাগ করে বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে না ইত্যাদি।

১৫. বিদায় ভাষণে এক লক্ষেরও বেশি সাহাবায়ে কেরামের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

اَلَا فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

'হে আমার সাহাবায়ে কেরাম! খুব খেয়াল করে শুনে রাখো, আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। নারীদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছি।'

ক্ষেত-খামার ও বৃক্ষ রোপণের সুন্নাত তরীকা

১. সব জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা রয়েছে। সুতরাং ক্ষেত-খামারও আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরীকা অনুযায়ী করা উত্তম। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমে নামায আদায়ের পরে যমীনে রিযিক তালাশের নির্দেশ দিয়েছেন।

২. যমীনের ফসল দেওয়ার ক্ষমতা নাই। ফসল দেওয়ার জন্য সে আল্লাহর হুকুমের মুখাপেক্ষী, এ কথা বিশ্বাস করা।

৩. জমি থেকে যে ফসল আল্লাহ পাক দেবেন, এটা খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করা এবং দ্বীনের রাস্তায় ও অসহায় দরিদ্রদের পেছনে খরচ করা।

৪. ক্ষেত-খামারের সকল কার্যাবলি 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা।

৫. হাল চাষে গরু, মহিষ, গাধা ইত্যাদি ব্যবহার করলে তাদেরকে ভালোভাবে ঘাস ও দানাপানির ব্যবস্থা করা এবং যথাসম্ভব তাদেরকে বিশ্রাম দেওয়া।

৬. গবাদি পশু চালানোর সময় অন্যের ফসলের ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৭. মুয়াজ্জিন আযান দেওয়ার সাথে সাথে চাষাবাদ ছেড়ে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করা।

৮. গাছ লাগানোও একটি বড় সাওয়াবের কাজ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যদি কোনো মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোনো শস্য ফলায়, আর তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা প্রাণী ভক্ষণ করে, তাহলে তার জন্য তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

৯. নিজে ফল ভোগ না করতে পারলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গাছ লাগিয়ে যাওয়া কর্তব্য। একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা রা.-এর কাছে এসে দেখলেন, তিনি আখরোটের চারা রোপণ করছেন। লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে আখরোটের চারা রোপণ

করছেন? এতে তো ফল আসতে অনেক সময় লাগবে। জবাবে তিনি বললেন, তাতে ক্ষতি কি? আমি না খেতে পারলেও অন্যরা খাবে, আর আমি তার সওয়াব পাব।

১০. গাছের পরিচর্যা করাও অধিক পুণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি একটি বৃক্ষ রোপণ করল এবং ফলদান পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করল, ওই বৃক্ষের প্রত্যেকটি ফলের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে তার জন্য রয়েছে সদকা, অর্থাৎ দানের সওয়াব।'

১১. গাছ লাগানোর সময় ওই গাছটি আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াক্ফ করতে পারলে ভালো। যাতে কেউ তার ফল খেলে বা কোনো উপকার গ্রহণ করলে দাবি না থাকে।

১২. এমন জায়গায় গাছ লাগানো, যার দ্বারা পরবর্তীতে মানুষের কষ্টের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

সালাম বিনিময়ের সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইহুদি ও নাসারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ কোরো না। ইহুদিদের সালাম হলো আঙুলের ইশারায় এবং নাসারাদের সালাম হলো হাতের তালুর ইশারায়। আর যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে আমার উম্মত নয়। (তিরমিযী)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মাথা ঝুঁকিয়ে বা হাতের ইশারায় সালাম বা তার জবাব দিতেন না। তবে অনেক দূর থেকে হলে ইশারা করা জায়েয। (আদাবুল মুফরাদ)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে সালাম দিতেন এবং বলতেন, আগে সালাম প্রদানকারী গর্ব ও অহংকার থেকে মুক্ত থাকে।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বলে সালাম দিতেন। (যাদুল মাআদ)

৫. ঘরে বা মসজিদে প্রবেশের সময় যদি কোনো লোক না থাকে, তাহলে

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

বলে সালাম দিতে হবে এবং ফেরেশতাগণের নিয়ত করতে হবে।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ছোট বড়কে, চলন্ত ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে, আরোহী পদচারীকে, সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠকে সালাম দেবে। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ নিয়মের ব্যতিক্রম জায়েয। যদি কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ছোটদেরকে সালাম দেয়, তাও জায়েয। নিজের নম্রতা-ভদ্রতার কারণে বা আত্মসংশোধনের জন্য সালাম দেওয়া আরও প্রশংসনীয়। অহংকারের বশবর্তী হয়ে নিজে সালাম না করে অন্যের সালাম পাওয়ার জন্য বসে থাকা মারাত্মক গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিজে আগে সালাম দিতেন। এর দ্বারা তাঁর সম্মান কমে যায়নি।

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলন্ত দুই ব্যক্তির মাঝে কোনো আড়াল পড়ে গেলে দ্বিতীয়বার সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ)

৯. অমুসলিমকে যদি কখনো বাধ্য হয়ে সালাম দিতে হয়, তাহলে বলবে,

اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো সাথে কথা বলার আগে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করতেন। কেউ সালাম না দিয়ে প্রশ্ন করলে জবাব না দিয়ে বলতেন, 'ফিরে যাও, আগে সালাম বলো, এরপর বলো আমি আসব কি?'

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরস্পরে সাক্ষাতের পূর্ণতা হলো সালামের সঙ্গে মুসাফাহা করা। (আহমাদ)

১২. নারীদের মধ্যে পরস্পরে সালাম বলা ও মুসাফাহা করা সুন্নাত। (বায়হাকী, তাবরানী)

১৩. কোনো মজলিসে মুসলমান এবং বিধর্মী মিশ্রিত থাকলে তখন মুসলমানদের নিয়ত করে সালাম দেবে। (আদাবুল মুআশারাত)

সালামের জবাব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১. সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। জামাতের মধ্য থেকে একজন জবাব দিলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

২. সালামের জবাব শুনিয়ে দেওয়া জরুরি (যদি সালামদাতা নিকটে থাকেন)। আর যদি দূরে থাকেন, তাহলে মুখে জবাব দেওয়ার সাথে ইশারা দ্বারাও তাকে অবহিত করবে। বিনা প্রয়োজনে ইশারা করবে না।

৩. স্পষ্টভাবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَام বলা ওয়াজিব।

৪. কেউ যদি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে, তাহলে তার জবাবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বাড়িয়ে বলবে। এমনিভাবে কেউ যদি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ সালাম দেয় তবে তার জবাবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বাড়িয়ে বলবে। (মুসনাদে আহমাদ)

৫. বেদ্বীনদের কেউ যদি সালাম দেয়, তাহলে তার জবাবে বলবে— وَعَلَيْكُمْ

৬. যদি কোনো যুবতী গায়রে মাহরামকে সালাম দেয়, তাহলে তার জবাব দিতে চাইলে মনে মনে দিতে হবে, জোরে নয়। তবে বৃদ্ধ নারীর সালামের জবাব ছোট আওয়াজে দেওয়ার অনুমতি আছে।

পরস্পরে কথা বলার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো সাথে কথাবার্তার পূর্বে সালাম দিতেন।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা সে এতে মনে কষ্ট পাবে; তবে হ্যাঁ, তিনের অধিক লোক থাকলে কাউকে বাদ দিয়ে কথা বলায় দোষ নেই। (বুখারী)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে কথা বলতেন না; বরং অপর ব্যক্তিকে কথা বলার সুযোগ দিতেন। (বুখারী)

৪. অগত্যা কখনো যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপছন্দনীয় কথা বলতেই হতো, তাহলে ইশারা-ইঙ্গিতে বলতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হলে সাহাবিগণ কথা বলতেন। তাঁর কথা বলার সময় সাহাবিগণ কথা বলতেন না। (শামায়েল)

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাপ করতে করতে অপরের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিতেন, যাতে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়। (ইবনে সাআদ)

৭. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তোমাদের মতো বরাবর একঘেয়ে স্বরে (তাড়াতাড়ি) হতো না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, তাঁর প্রত্যেকটা কথা আলাদা আলাদা হতো। যারা তাঁরা কাছে বসতেন, তাদের কানে কথাগুলো গেঁথে যেত। (শামায়েল)

৮. হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো একটি কথা তিনবার বলতেন, যাতে শ্রোতা তাঁর কথা উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারে। (শামায়েল)

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাহীন, অশালীন ও বিশ্রী কথায় অভ্যস্ত ছিলেন না এবং এ জাতীয় কথা কখনো মুখে আনতেন না। (মুসনাদে আহমাদ)

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে অভিশাপ দিতেন না এবং গালিগালাজ করতেন না। (শামায়েল)

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী)

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কথা শুনতে চাইলে

রাস্তার এক কিনারায় দাঁড়িয়ে বা কোথাও বসে কথা শুনতেন। (ইবনে সাআদ)

১৩. কথা শোনার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কথায় হস্তক্ষেপ করতেন না; বরং তাকে বুঝিয়ে দিতেন।

১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনী, গরিব সকলের কথা আগ্রহ সহকারে শুনতেন। (তিরমিযী)

১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। (যাদুল মাআদ)

১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক লোকের কথা শুনতে থাকলে সবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা শুনতেন।

১৭. কেউ চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে কান পেতে দিতেন। (ইবনে সাআদ)

১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কেউ আলাপে বসলে সে না উঠা পর্যন্ত নবীজি উঠতেন না।

১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেউ অপছন্দনীয় কথা বলতে চাইলে তিনি দ্বীনের কথা বলে তা এড়িয়ে যেতেন।

২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো কাজের কথা শুনলে প্রশংসা করতেন এবং মন্দ কাজের কথা শুনলে নিন্দা করতেন।

২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে ডাকতে হলে সরাসরি নাম ধরে ডাকতেন না; বরং উপনাম ধরে ডাকতেন।

২২. কারো নাম জানা না থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের 'আবদুল্লাহ' বলে ডাকতেন। আর নারীদের 'উম্মে' শব্দ লাগিয়ে উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা এভাবে ডাকতেন; যদিও সে অবিবাহিতা হতো। (যাদুল মাআদ)

২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ডাকের জবাবে নাম না বলে শুধু 'আমি আমি' বললে খুবই নারাজ হতেন এবং পুরো নাম যেমন আমি 'আব্দুর রহীম' আমি 'আব্দুল করীম' এভাবে বলতে নির্দেশ দিতেন। প্রয়োজনে পিতার নামসহ বলতে বলেছেন। (বুখারী)

ভ্রমণের সুন্নাত তরীকা

১. সফর করার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়া।

২. সফর থেকে ফিরে আসার পর দু-রাকাত নফল নামায পড়া।

৩. সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বক্ষণে নিম্নের দোয়া পাঠ করা,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

৪. সফরে অবশ্যই কমপক্ষে একজন সাথি থাকা জরুরি। (তবে অতি প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে একা সফর করতে নিষেধ নেই।) (ফাতহুল বারী)

৫. হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন নিম্নের দোয়া পড়তেন। (মুসনাদে আহমদ)

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَسِيْرُ

৬. সফর অবস্থায় মাঝে মাঝে এই সূরাগুলো পড়া :

ক. সূরা কাফিরূন,

খ. সূরা নসর,

গ. সূরা ইখলাস,

ঘ. সূরা ফালাক,

ঙ. সূরা নাস।

হযরত যোবায়ের ইবনে মুতইম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় উক্ত পাঁচটি সূরা মাঝেমধ্যে পড়বে, সে সফর অবস্থায় সমস্ত বিপদ আপদ থেকে নিরাপদে থাকবে এবং তার সফর সফল হবে। (হিসনে হাসীন)

৭. স্থলযানে আরোহন করার সময় প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ডান পা দিয়ে উঠা।

৮. হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন তিনবার بِسْمِ اللهِ পড়তেন। (তিরমিযী)

৯. অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়তেন,

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

১০. অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়তেন। (তিরমিযী)

১১. তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়তেন। (তিরমিযী)

১২. অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এই দোয়া পড়তেন,

سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

১৩. এরপর খুশির ভাব প্রকাশের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু মুচকি হাসি দিতেন। (তিরমিযী)

১৪. নৌযানে উঠার সময় এই দোয়া পড়তে হয়,

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১৫. যানবাহন হতে নামার পূর্বে এই দোয়া পড়তে হয়,

رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مَنْزِلًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

১৬. সকল যানবাহন হতে নামার সময় বাম পা দিয়ে নামা সুন্নাত।

ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন 'বিসমিল্লাহ' বলে দরজা খুলতেন। (আবু দাউদ)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হতে নির্দেশ করেছেন।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়তেন,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘর থেকে বের

হওয়ার সময় ধীরে ধীরে বের হতেন এবং খুব চুপিসারে জুতা পরতেন। (যাদুল মাআদ)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বাইরে যেতে হলে আওয়াজ করা ছাড়া বের হতেন এবং বের হওয়ার সময় পূর্বোল্লিখিত দোয়া পড়তেন। (তিরমিযী)

অন্যের ঘরে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা

১. কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক দরজা বরাবর দাঁড়াতেন না; বরং একটু ডান বা বাম দিকে সরে দাঁড়াতেন।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরবাসীদের নিজের আগমনের কথা জানানোর জন্য (দিনে হলে) জোরে সালাম দিতেন। ঘরবাসী না শুনলে আবার সালাম দিতেন। এভাবে তিনবার সালাম দিতেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইতেন। অনুমতি না পেলে ফিরে আসতেন।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের ঘরে এত বেশি দেরি করতেন না, যাতে তাদের কষ্ট হয়। (যাদুল মাআদ)

মজলিসের সুন্নাতসমূহ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

২. মজলিসের সম্মানিত আসনে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে বসবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজের ভাইয়ের সম্মানের আসনে তার অনুমতি ছাড়া কেউ যেন না বসে। (তিরমিযী)

৩. কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে স্থানে বসবে না; বরং অন্যকে তার স্থানেই বসতে দেবে। তবে ওই ব্যক্তির দায়িত্ব হলো আগত ভাইয়ের জন্য বসার সুযোগ করে দেওয়া। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আসন গ্রহণকারীদের দায়িত্ব হলো, তারা যেন অন্যকে স্থান করে দেওয়ার জন্য মজলিস প্রশস্ত করে। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, কোনো মুসলমান ভাই তোমার কাছে এলে স্থান থাকা সত্ত্বেও তার সম্মানার্থে একটু নড়েচড়ে বসবে। (বায়হাকী)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিসের শেষে তাশরীফ রাখলে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন এবং অন্যদেরকে এর উপর আমল করার নির্দেশ দিতেন। (আবু দাউদ)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মজলিসে যদি খারাপ কথাবার্তা বা গোনাহের কথা হয়ে থাকে, তাহলে মজলিস শেষে এই দোয়া পাঠ করলে তার কাফ্ফারা হয়ে যায়,

سَبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

আতিথেয়তার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানের খেদমত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং নিজ হাতে মেহমানদারি করতেন। (মাদারেজুন নবুওয়াহ)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিথিদের বারবার খেতে বলতেন। একবার জনৈক ব্যক্তিকে পান করানোর পর তিনবার বলেন আরও পান করো, আরও পান করো, আরও পান করো। অবশেষে সে কসম খেয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আর পান করার সাধ্য নেই। (বুখারী)

৩. কোনো বিদেশি মেহমান আগমন করলে তার খবরাখবর নিতেন।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানের আগমনের কথা জানতে পারলে ঘরের বাইরে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন। (বুখারী)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেকে মেহমানকে তার মর্যাদা অনুযায়ী গ্রহণ করবে এবং সে হিসেবে তার সেবা যত্ন করবে। (মুসনাদে আহমাদ)

৬. মেজবান মেহমানের সাথে এমন কাউকে খাবারে একত্রে বসাবে না, যার

মনমানসিকতা ও রুচি অসুন্দর হওয়ার কারণে মেহমানের খাবারে অরুচি হতে পারে।

৭. সাধ্য ও প্রচলন অনুযায়ী মেহমানের জন্য অন্তত একদিন আড়ম্বরের সাথে খাবারের আয়োজন করা সুন্নাত।

৮. সম্ভব হলে বিদায়ের সময় মেহমানকে কিছু হাদিয়া উপঢৌকন প্রদান করা।

৯. বিদায়ের সময় মেহমানকে ঘর থেকে দরজা পর্যন্ত সাথে গিয়ে বিদায় দেওয়া সুন্নাত।

হাদিয়া দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একে অপরকে হাদিয়া দেবে, হাদিয়া অন্তরের কলুষতা দূর করে। এক পড়শি অপর পড়শিকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ যেন তা সামান্য মনে না করে, যদিও তা এক টুকরো বকরীর খুর হয়। (মেশকাত)

২. কোনো মুসলমানের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং মহব্বতের সাথে হাদিয়া দেওয়া উচিত; অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়।

৩. হাদিয়া পেশ করার পূর্বে বা পরে নিজের কোনো উদ্দেশ্যের কথা না বলা আদব, এতে হাদিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

৪. হাদিয়া গোপনে দেওয়া উচিত।

৫. নগদ অর্থ হাদিয়া দিলে মুসাফাহার সময় দেওয়া ঠিক নয়।

৬. নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু হাদিয়া দিলে এত পরিমাণ দেওয়া ঠিক নয়, যা তার পক্ষে বহন করে নেওয়া কষ্টকর। এরূপ হলে পৌঁছে দিতে হবে।

৭. নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু হাদিয়া দিলে যাকে দেওয়া হয় তার আগ্রহ কীসের উপর সেটা জেনে দেওয়া উত্তম।

৮. সুসম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর হাদিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথায় গ্রহণকারীর জন্য এটা লজ্জার কারণ হতে পারে।

৯. কেউ হাদিয়া দিলে তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মধুর হয়। জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে দান করা

হয়েছে তার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এর প্রতিদান দেয়, আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন প্রশংসা করে। কেননা যে প্রশংসা করল, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল; আর যে তা গোপন করে, সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (মেশকাত)

১০. যার অধিকাংশ বা পূর্ণ উপার্জন হারাম, তার হাদিয়া গ্রহণ না করা।

১১. হাদিয়া গ্রহণ করার সাথে সাথে প্রদানকারীর সামনেই অন্যকে ওই হাদিয়ার জিনিসটা না দেওয়া উচিত। এতে হাদিয়া প্রদানকারীর অন্তরে কষ্ট লাগতে পারে।

১২. যে বস্তু হাদিয়া প্রদান করা হলো, তার মূল্য জিজ্ঞাসা না করা। এতে ওই জিনিসটার মূল্য কম হলে হাদিয়া প্রদানকারী তার হাদিয়া তুচ্ছ মনে করা হচ্ছে ভেবে কষ্ট পেতে পারে।

রোগী দেখার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অসুস্থ ব্যক্তির শয্যার পাশে হাজির হও এবং তার দ্বারা দোয়া করাও। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় এবং তার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। (তাবরানী)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমান যদি কোনো মুসলমান রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা বা খবর নেওয়ার জন্য সকালে যায়, তাহলে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যায় যায়, তাহলে সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত সারারাত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (তিরমিযী)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন রোগীর পাশে যাবে, তখন তার হায়াত বৃদ্ধির জন্য দোয়া করবে। এতে তার মন সান্তনা পাবে।

৪. রোগীর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা সুন্নাত। যাতে বেশিক্ষণ তার নিকট বসে থাকার কারণে তার কষ্ট না হয় এবং তার ঘরের লোকজনের কাজে অসুবিধা না হয়। (মেশকাত)

৫. যখন রোগী দেখতে যাবে, তখন নিম্নের দোয়া পড়বে,

لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

৬. অতঃপর তার সুস্থতার জন্য নিম্নের দোয়া সাতবার পড়া সুন্নাত,

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

পশু-পাখি ও জীব-জন্তুর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১. অযথা কোনো পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া অন্যায়। যেমন পাখির বাসা থেকে বাচ্চাদের নিয়ে এসে তার মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া। এটা নিষ্ঠুরতার পরিচয়। (মেশকাত)

২. যে-সব প্রাণী দ্বারা মানুষের কোনো কাজ হয় না, তাদেরকে আটকে রেখে তাদের জন্মগত স্বাধীনতা নষ্ট করা বৈধ নয়।

৩. যে-সব প্রাণী মানুষের উপকারে আসে, তাদেরকে অনর্থক হত্যা করবে না । (মেশকাত)

৪. যে-সব পশুপাখি খাওয়ার উপযুক্ত নয়, তাদেরকে শুধু মনের আনন্দের জন্য বা হাতের নিশানা ঠিক করার জন্য শিকার করা জায়েয নয়।

৫. যে-সব প্রাণী দ্বারা কাজ নেওয়া হয়, তাদেরকে নিয়মিত আহার দেওয়া এবং তাদের বিশ্রামের প্রতি যথাযথ লক্ষ রাখা উচিত ।

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর বাগানে অবস্থান নিলেন। সেখানে একটি উট বাঁধা ছিল। উটটি নবীজিকে দেখে উচ্ছসিত হয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। নবীজি উটটির কাছে গিয়ে তার কান ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, এই উটটি কার? এক আনসারী যুবক বলল, উটটি আমার। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই বোবা প্রাণীটির ব্যাপারে— আল্লাহ যাকে তোমার মালিক বানিয়েছেন, সেই আল্লাহকে কি তুমি ভয় করো না? উটটি আমার নিকট অভিযোগ করে বলছে, তুমি তাকে ঠিক মতো আহার করাও না এবং তার সাথে সদয় আচরণ করো না।

৬. চতুষ্পদ প্রাণীর পিঠে বা গাড়িতে মাল বোঝাই করে বিলম্ব করবে না। গন্তব্যে পৌঁছার সাথে সাথে বোঝা নামিয়ে নেবে ।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা গন্তব্যে পৌঁছাবার পর উটের পিঠের মালামাল না নামানো পর্যন্ত নামায আদায় করতাম না।

৭. পথ চলার সময় চতুষ্পদ প্রাণীকে রাস্তার মাঝে ঘাস খাইয়ে নেবে। অন্যথায় গন্তব্যে পৌঁছে দ্রুত তার খাবারের ব্যবস্থা করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমরা সবুজ-শ্যামল ভূমিতে সফর করবে, তখন উটগুলোকে সবুজ-শ্যামলিমার স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে উপকরণ পৌঁছাবে (অর্থাৎ, পথের মাঝে বিরতি দিয়ে তাদের ঘাস খাইয়ে নেবে)। আর যখন দুর্ভিক্ষের সময় তাদের নিয়ে পথ চলবে, তখন তাদেরকে দ্রুত চালাবে। এতে দুর্ভিক্ষাবস্থায় তাদের যে খাদ্যকষ্ট হওয়ার ছিল, তা থেকে তারা রক্ষা পাবে।' (মুসলিম)

৮. যে প্রাণীকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার দ্বারা সেই কাজ নেওয়াই সংগত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'এক ব্যক্তি ষাঁড়ের উপর আরোহন করলে ষাঁড়টি মুখ ফিরিয়ে তাকে বলল, আমাকে এই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে হালচাষের জন্য।' (বুখারী)

৯. জীবজন্তুকে গালি দেবে না এবং তাদেরকে নাপাক খাবার খাওয়াবে না।

১০. অকারণে কোনো প্রাণীকে বধ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ এবং লটুয়া (আড়ি কোকিল) মারবে না। (আবু দাউদ)

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রত্যেক বিষয়ে দয়াপরবশ হওয়াকে আবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন কোনো প্রাণীকে জবেহ করবে, দয়ার্দ্রতার সাথে জবেহ করবে। জবেহের সময় তোমাদের ছুরিকে খুব ধার করে নেবে এবং জবেহকৃত জন্তুকে কষ্ট দেবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিদআতের আলোচনা

বিদআতের নিকৃষ্টতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরকের পরেই বিদআতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক কঠোরতা আরোপ করেছেন। সম্ভবত অন্য কোনো ব্যাপারে তিনি এতটা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেননি। এর মূল কারণ হলো, বিদআতের দ্বারা দ্বীনের প্রকৃত কাঠামো ও আসল নকশা পরিবর্তিত হয়ে যায়। হক ও বাতিলের মধ্যকার কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না।

কোরআনুল কারীম স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, দ্বীন-ইসলাম বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ দুটি : এক. সত্য গোপন করা; যাকে 'কিতমানুল হক' বলা হয়। দুই. হক-বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য রেখা মুছে ফেলা; যাকে তালবীসে হক ওয়া বাতিল বলা হয়। দ্বিতীয় ধারার আগ্রাসী থাবায় আল্লাহ পাকের দ্বীন মানুষের প্রবৃত্তির খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়। কেউ হয়তো নিজের মনমতো কোনো বিষয় বানিয়ে নিলো, আবার কেউ হয়তো দ্বীনের কোনো কাজকে দ্বীন থেকে খারিজ করে বসল। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর দ্বীন খেলনার বস্তুতেই পরিণত হয়। তাই এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, সাওয়াবের কাজ কোনটি আর গোনাহের কাজ কোনটি—তা নির্ণয় করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা দিতে পারে না। নবী রাসূলগণের কাজ শুধু লোকজনের নিকট তা পৌঁছে দেওয়া এবং সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। সে মতে নিজের মতানুসারে কোনো কাজকে সাওয়াব কিংবা গোনাহের কাজ মনে করা নিজেকে প্রভু বলে দাবি করারই নামান্তর, নাউযুবিল্লাহ।

মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ও বাস্তব নমুনা হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন এবং পুরোপুরি তাঁকে মান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, মনমতো জীবন কাটাবার সুযোগ একটুও রাখেননি। ইরশাদ হচ্ছে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।’ (সূরা মায়িদা : ৩)

ইসলাম সম্পূর্ণ হয়েছে আল্লাহর এ ঘোষণার মাধ্যমে। অতএব, এখানে নতুন কিছু সংযোজন ও বিয়োজনের সুযোগ নেই।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, ‘যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো বিদআত উদ্ভাবন করে এবং মনে করে যে এই কাজটি ভালো, তাহলে বুঝতে হবে, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেয়ানত করেছেন, তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেননি। কারণ আল্লাহ বলেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং যে বিষয় দ্বীনের অংশ ছিল না, পরে আর তা কখনো দ্বীনের অংশ হতে পারে না।’ আল্লাহ পাক আরও বলেন,

وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

‘রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।’ (সূরা হাশর : ৭)

আল্লাহ পাক আরও বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

> ‘তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর স্মরণ বেশি বেশি করে, তাদের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ (সূরা আহযাব : ২১)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের জন্য সর্বোত্তম নমুনা ঘোষণা করে আমাদের চালচলন, আচার- আচরণের প্রতিটি ক্ষেত্র ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের সর্বাবস্থায় তাঁর মত ও পথ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> ‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’ (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সর্বোত্তম আদর্শ ও জীবনচরিত অনুকরণের নামই হলো সুন্নাত, আর এর ব্যতিক্রম করাকে বলা হয় বিদআত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উম্মতকে আল্লাহর নৈকট্যের সকল পথ বাতলে দেওয়া তাঁর দায়িত্ব এবং তিনি তা পালন করেছেন। সুতরাং তাঁর সুন্নাতের বাইরে আল্লাহ নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের কোনো পথ থাকতে পারে না। নবীজি বলেন,

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ مِنْ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ

> ‘আমার পূর্বের প্রত্যেক নবীরই দায়িত্ব ছিল যে, স্বীয় উম্মতের জন্য যত ভালো বিষয় জানেন সে বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশনা দান করবেন এবং তাদের জন্য যত খারাপ বিষয়ের কথা জানেন, সেগুলো থেকে তাদেরকে সাবধান করবেন।’ (মুসলিম)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

'জান্নাতের নিকটে নেওয়া ও জাহান্নাম থেকে দূরে রাখার সকল বিষয়ই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হলো।'

এ সকল হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নতুন কোনো রীতি-পদ্ধতি চালু করার আবশ্যকতা আর নেই।

বিদআত সম্পর্কে ভাষাবিদগণের বক্তব্য

পাঠক, নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছেন, যেসব আচার-আচরণ কোরআন, হাদীস, ইজমা ও শরয়ী কিয়াস দ্বারা সমর্থিত নয় এবং যেগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও অনুপম আদর্শ প্রদত্ত কাঠামোর পরিপন্থি, সেগুলোকে দ্বীন মনে করে পালন করাই বিদআত।

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক, আবুল ফাতাহ নাসির ইবনে আব্দুস সাইয়েদ আল-মিতরাযী লেখেন,

الْبِدْعَةُ اِسْمٌ منْ ابْتِدَاعِ الْأَمْرِ إِذَا ابْتَدَأَهُ وَأَحْدَثَهُ كَالرِّفْعَةِ اِسْمٌ مِنَ الْاِرْتِفَاعِ وَالْخِلْفَةُ اِسْمٌ مِنَ الْاخْتِلَافِ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى مَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ أَوْ نُقْصَانٌ مِنْهُ

'বিদআত اِبْتِدَاع শব্দের বিশেষ্য রূপ, যার অর্থ নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। যেমন رفعة শব্দটি ارتفاع শব্দ থেকে এবং خِلْفَة শব্দটি اختلاف শব্দ থেকে এসেছে। আক্ষরিক অর্থে শব্দটি যদিও সর্ববিধ উদ্ভাবনকে শামিল করে, কিন্তু দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহারের দরুন এখন শব্দটি কেবল উক্ত অর্থই নির্দেশ করে থাকে।' (মাগরিব : ১/৩০)

বিশিষ্ট ভাষাপণ্ডিত ইমাম রাগিব ইস্পাহানী রহ.-এর মতে,

البِدْعَةُ فِي الْمَذْهَب إِيْرَادُ قَوْلٍ لَمْ يَسْتَنْ قَابِلُهَا أَوْ فَاعِلُهَا فِيهِ بِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَأَمْثَالُهَا الْمُتَقَدِّمَةُ وَأُصْوَالُهَا الْمُتَقَنَّةُ

‘এমন কথা বা কাজকে বিদআত নামে নিরূপণ করা হয়, যার কর্তা শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ নয় এবং যা শরীয়তের কাঠামো ও মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’ (মুফরাদাতুল কোরআন, পৃষ্ঠা : ৩৭)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর ইবনে আব্দুল কাদির রাযী রহ. বলেন,

الْبِدْعَةُ- الْحَدَثُ فِي الدِّيْنِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ

‘দ্বীন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার পর তাতে নতুন রুসম-রেওয়াজ যোগ করে দেওয়াকে বিদআত বলে।’

মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-জালাল আল-কুরাইশী রহ. লেখেন,

كُل شَيْءٍ عَمَلٌ عَلَى غَيْرِ مِثَالِ سَبَقٍ

‘দ্বীন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার পর তাতে নতুন রুসম চালু করা বিদআত।’

আরবী প্রসিদ্ধ অভিধান মিসবাহুল লোগাতের ২৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, বিদআত অর্থাৎ নমুনাবিহীন তৈরিকৃত বস্তু, ধর্মের মধ্যে প্রচলিত নতুন রেওয়াজ, এমন আকীদা বা আমল যা ইসলামের প্রাথমিক তিন যুগে ছিল না।

প্রসিদ্ধ অভিধান ফীরোযুল লোগাতে ‘বিদআত’ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে, দ্বীনের মধ্যে জুড়ে দেওয়া নতুন কথা, নতুন প্রথা কিংবা কোনো নিয়ম-নীতি।

মোটকথা, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত এবং পরম্পরাগত নিয়ম-নীতি ভেঙে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাকে বলা হয় বিদআত।

শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত

হানাফী মাযহাবের খ্যাতনামা হাদীস বিশারদ আল্লামা হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী রহ. লেখেন,

الْبِدْعَةُ فِي الْأَصْلِ إِحْدَاثُ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

‘মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না এমন কিছু উদ্ভাবন করাই মূলত বিদআত।’ (উমদাতুল কারী : ৫/৩৫৬)

প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লেখেন,

وَالْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أَحْدَثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَتَطْلُقُ فِي الشرع فِي مقابل السّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُوْمَةً

'আক্ষরিক অর্থে বিদআত হলো, পূর্ব উদাহরণ ব্যতীত সম্পূর্ণ নতুনভাবে কিছু সৃষ্টি করা। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাতের বিপরীত কাজ বা কথাকে বিদআত বলে। সুতরাং তা মন্দ ও গর্হিত।' (ফাতহুল বারী : ৪/২১৯)

আল্লামা মুরতাজা যুবাইদী হানাফী রহ.-এর মতে,

«كُل مُحْدَثَةٍ بِدْعَة» إِنَّمَا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوَافِق السّنَّةِ

'সব মনগড়া বস্তু বিদআত'—হাদীসটি দ্বারা যা শরীয়তের উসূল ও সুন্নাতের সাথে সংগতিশীল নয়, সে বিষয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।' (তাজুল ওরুস : ৫/২৭১)

হাফেজ ইবনে রজব রহ. লেখেন,

وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَا أَحْدَثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدلّ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْل مِنَ الشَّرْعِ يَدِلّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِدْعَةٌ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ بِدْعَةٌ لُغَةٌ

'শরীয়তের মূল ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয় এমন আচার-আচরণই বিদআত। পক্ষান্তরে শরীয়তের মূল ভিত্তির সাথে মিল রেখে যে বিষয় উদ্ভাবন করা হয়েছে, আক্ষরিক অর্থে তা বিদআত হলেও ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বিদআত নয়।' (জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা : ১৯৩)

আল্লামা আবু ইসহাক গারমাতী রহ. বিদআতের নিম্নরূপ সংজ্ঞা পেশ করেছেন,

طَرِيقَةٌ فِي الدِّيْنِ مُخْتَرِعَة تَضَاهِي الشَّرِيعَةِ يَقْصُدُ بِالسّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبّدِ لِلهِ سُبْحَانَهُ

'দ্বীনের নামে রচিত কর্মপন্থা যা বাহ্যত শরীয়ত বলে মনে হয় এবং যা বিশিষ্ট ইবাদত বিবেচনায় করা হয়, তা-ই বিদআত।' (আল-ইতেসাম : ২/৩০০)

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ. লিখেছেন,

الْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْل فِي الشَّرْعِ وَسُمِّيَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بدعة

'বিদআত বলতে বোঝায় এমন জিনিস, যা দ্বীনের ক্ষেত্রে অভিনব, শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই, মৌলিক সমর্থন নেই। শরীয়তের পরিভাষায় তারই নাম বিদআত।'

ইবাদতের ক্ষেত্রে মনগড়া পদ্ধতি বিদআত

বিদআত মন্দ হওয়ার জন্য শুরুতেই কাজটি মন্দ হতে হবে এমনটি জরুরি নয়। শরীয়ত যে আমলের জন্য কোনো শর্তারোপ করেনি, তাতে নিজ পক্ষ থেকে শর্তারোপ করা কিংবা তার রূপরেখা পরিবর্তন করে নতুন কিছু সংযোজন করা বিদআত, আমলটি যত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই হোক না কেন। ইসলামে তা কোনোভাবেই গ্রহণীয় নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تَخْتَصّوا لَلَّيْلَةَ الْجُمُعَةَ بِقِيَام مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةَ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ

'নফল নামাযের জন্য জুমুআর রাত এবং নফল রোযার জন্য জুমুআর দিনকে নির্দিষ্ট কোরো না। এমনিতে ধারাবাহিক রোযা রাখতে গিয়ে যদি জুমুআর দিন পড়ে যায়, সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা।' (মুসলিম : ১/৩৬১)

নবীজির এ কথা থেকে বুঝা গেল, কেবলমাত্র জুমুআর নামাযের কারণেই জুমুআর দিন ফযীলতপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ ফযীলতকে কেন্দ্র করে নফল নামাযের জন্য জুমুআর রাত এবং নফল রোযার জন্য জুমুআর দিনকে নির্দিষ্ট করে নেয়া আদৌ ঠিক হবে না।

হাফেজ ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. বলেন, 'সময়, অবস্থা কিংবা বিশেষ পন্থা-পদ্ধতির সাথে এরূপ বিশেষণের জন্য দলীল থাকা আবশ্যক। কারণ, শরয়ী দলীল ছাড়া উক্ত পন্থাটির কল্যাণ কীভাবে প্রমাণিত হতে পারে?'

তিনি রাফেযীদের কুসংস্কার ঈদে গদীরের সমালোচনা করে বলেন, 'শীয়াগণ ঈদে গদীর নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদোৎসব আবিষ্কার করেছে। এটাও একটি কুসংস্কার। অনুরূপ প্রতি বছরের একই দিনে একই নিয়মে তা পালন করার জন্য সমাবেশ করাও শরীয়তসম্মত নয়। কারণ এর পেছনে শরয়ী কোনো দলীল নেই। তদ্রূপ যে ইবাদতের জন্য শরীয়ত সুনির্দিষ্ট নিয়ম করে দিয়েছে, সেখানে ভালো মনে করে নিজের পক্ষ থেকে কিছুটা রদবদল করাও বৈধ নয়। কেননা ইবাদতের মূল আবেদন হলো নির্দ্বিধায় তা মেনে নেওয়া তথা দাসত্ব প্রকাশ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে প্রাপ্ত কাঠামো অনুযায়ী ইবাদত করার মধ্যে সে আবেদনের প্রতিফলন ঘটে।' (আহকামুল আহকাম : ১/৫৪)

মনগড়া পন্থায় ইবাদত সম্পর্কে সাহাবীদের অভিমত

সাহাবায়ে কেরাম রা. কখনো নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী বন্দেগি করেননি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে চলেছেন। সুন্নাতে নববীর আয়নাকে সামনে রেখে তাঁরা নিজেদের গোটা জীবন সাজিয়েছেন। আর পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন ইত্তেবায়ে রাসূলের এক প্রাণবন্ত নমুনা ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সারমর্ম হলো, মসজিদের পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি যিকিরকারী একদল লোক দেখতে পান। তাদের মধ্যে একজন সমবেত লোকদেরকে বলছেন, একশবার পড়ুন 'আল্লাহু আকবার'। সে মতে উপস্থিত সকলে পাথরের

ছোট দানার সাহায্যে গুণে গুণে একশবার তা পড়ে নিচ্ছিল। অতঃপর সে বলছিল, একশবার পড়ুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সে মতে সবাই তা পড়ে নিচ্ছিল। তারপর সে বলছিল, একশবার পড়ুন 'সুবহানাল্লাহ'। সে মতে সকলে তা পড়ে নিচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা পাথর কণায় গুণে গুণে কী পড়ছিলে? তারা উত্তরে বলল, আমরা তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ পড়ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সমপরিমাণ গোনাহ গুণে নাও। এতে তোমাদের নেকি মোটেও বিনষ্ট হবে না বলে আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। হে প্রিয় নবীর উম্মতগণ, তোমাদের ব্যাপারে বড় আশ্চর্য বোধ হয়। তোমরা কীভাবে এত দ্রুত ধ্বংসের পথে পা বাড়ালে? অথচ তোমাদের মাঝে এখনো রাসূলের অনেক সাহাবী উপস্থিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধেয় বস্তুটিও পুরাতন হয়নি এবং তাঁর খাবারের পাত্রও ভেঙে যায়নি। ইতিমধ্যেই তোমরা বিদআত ও গোমরাহীর দুয়ার খুলতে শুরু করেছ? (মুসনাদে দারেমী, পৃষ্ঠা : ৮০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর এরূপ বলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যদিও বা 'সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' প্রভৃতি যিকিরের প্রচুর ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু যিকিরের জন্য গ্রহণকৃত এ খাস পন্থা ও ধরণটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে নয়; বরং তাদের মনগড়া। কাজেই এটি বিদআত ও গোমরাহী কাজ। এতে হেদায়াতের আলো নেই, আছে ভ্রষ্টতার অন্ধকার।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ রহ. বর্ণনা করেন, 'আমি এবং হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম, রাসূলপত্নী হযরত আয়েশা রা.-এর হুজরার পাশে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বসে আছেন। কতিপয় লোক তখন মসজিদে চাশতের নামায পড়ছিল। আমরা তাঁকে এদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটি বিদআত।' (বুখারী : ১/২৩৮; মুসলিম : ১/৪০৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী কর্তৃক বিশুদ্ধ সনদে চাশতের নামাযের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু যেহেতু সে যুগে তা জামাতে আদায় করা হতো না এবং এজন্য তেমন যত্ন নেওয়া হতো না, বরং সময়ে সুযোগে তা পড়ে নেওয়া হতো এবং সর্বোপরি তা নফল

নামায, যা মসজিদ অপেক্ষা ঘরে আদায় করাই শ্রেয়, তাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যখন লোকজনকে উক্ত নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত হতে এবং এর প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করতে দেখলেন, তখন তিনি ঘোর আপত্তি জানালেন এবং তাদের এ কাজকে বিদআত হিসেবে অভিহিত করলেন। এ কারণে ইমাম নববী রহ. হাদীসটির ব্যাখ্যায় লেখেন,

> مراده ان اظهارها فى المسجد والاجتماع لها هو بدعة لا ان اصل صلوة الضحى بدعة
>
> 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বক্তব্যের মর্ম হলো, নিয়ম-তান্ত্রিকরূপে মসজিদে চাশতের নামায পড়া, এর জন্য সমবেত হওয়া এবং সমধিক গুরুত্ব প্রদান করাই হচ্ছে বিদআত। প্রকৃতপক্ষে চাশতের নামায ভিত্তিহীন ও বিদআত একথা বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।' (শরহে মুসলিম : ১/৪০৯)

ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. বলেন, 'নিশ্চয় তোমরা লক্ষ করে থাকবে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর নিকট এভাবে সমবেত হয়ে চাশতের নামাযের সপক্ষে দলীল বিদ্যমান না থাকায় তিনি তা বিদআত বলেছেন। নামাযের সাধারণ দলীলের গণ্ডিভুক্ত করে তা অনুমোদিত প্রমাণ করার প্রয়াস চালাননি।'

ইবাদতের ক্ষেত্রে এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতা। আমরাও মনগড়া কিছু না করে ইসলামের স্বর্ণযুগের দিকে লক্ষ্য করতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসরণকারী তাবেয়ীগণ কোনো আমল করে থাকলে, তা গ্রহণ করা হবে; আর নচেৎ নয়।

প্রচলিত কিছু বিদআত

ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গভীর আস্থা ও ভালোবাসা প্রকৃত ঈমানের দাবি; এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গোটা জীবন নিয়ে আলোচনা করা ও তাঁর আদর্শের বিস্তারিত আলোকপাত করা নিঃসন্দেহে রহমতের ফল্গুধারা বয়ে আনবে। বছরের প্রতিটি মাস, মাসের প্রতিটি সপ্তাহ, সপ্তাহের প্রতিটি দিন, দিনের প্রতিটি ঘণ্টা, ঘণ্টার প্রতিটি মিনিট এমন কোনো মুহূর্ত নেই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা দূষণীয় হতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই, থাকতে পারেও না। তবে প্রশ্ন হলো, শুধু রবিউল আউয়ালের দ্বাদশ তারিখে তাঁর জন্মোৎসব পালন, মিলাদ মাহফিল উদযাপন ও আনন্দ মিছিল বের করা এবং বিশেষভাবে শুধু সেদিন দরিদ্র-অসহায়দের মাঝে খাদ্য বিতরণ করার প্রথা কতটা ন্যায়সংগত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এসব ছিল কি? অথবা সাহাবায়ে কেরাম রা. এবং তাঁদের অনুসরণকারী তাবেয়ীদের থেকে এরূপ প্রথা পালনের প্রমাণ আছে কি? যদি এরূপ প্রথা পালনের প্রমাণ ইসলামের এই সোনালি যুগে থেকে থাকে, তবে কারো সাধ্য নেই এতে সামান্য নাক গলাবার। কেননা তাঁরা যা গ্রহণ ও বর্জন করেছেন, সবটুকুর নামই দ্বীন; যার বিরুদ্ধাচরণ করা কোনো বে-দ্বীনের পক্ষেই শোভা পায়। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর নবীজি তেইশ বছর জীবিত ছিলেন। তারপর আসে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ, এর সময়কাল ছিল ত্রিশ বছর। ১১০ হিজরী পর্যন্ত চলে সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং তাবেয়ীদের সময়কাল অব্যাহত থাকে ২০০ বছর পর্যন্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় তাঁদের অন্তর ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান

প্রদর্শন তাঁদের চেয়ে বেশি আর কে করতে পারে? যদি তথাকথিত কিছু আশেকে রাসূল এ কথার প্রমাণ করতে পারেন যে, রাসূলের জীবদ্দশায় বা তাঁর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরাম বা তাঁদের অনুসরণকারী তাবেয়ীগণ এসব কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তবে আমরাও এর বৈধতা অবনত মস্তকে মেনে নেব, মানতে বাধ্য থাকব। কোনো মুসলমানই এতে তখন সামান্য আপত্তি তোলার সাহস পাবে না। কিন্তু যদি তারা উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের ব্যর্থ হওয়াটাই সুনিশ্চিত—তবে প্রশ্ন হলো, চাহিদা ও দাবি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উত্তম যুগের নিকট এ সমস্ত কার্যাবলি পূতপবিত্র ও সাওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচিত হলো না কেন? কোনো বাহানার আশ্রয় না নিয়ে শুধুমাত্র এই ইস্যুটিকে সামনে রেখে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিদআতিরা অধুনা বিদআত সমূহের যে-সব ফযীলত ও তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করে, ইসলামের উত্তম যুগের মনীষীগণ তবে কি তা বেমালুম ভুলে গেলেন? বিদআত বৈধ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে দলীলাকারে যে-সব বক্তব্য বিদআতিরা পেশ করে, সবই মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন অনর্থক প্রয়াস মাত্র। কোনো বিষয় দ্বীন ও সাওয়াবের কাজ কি না, তা কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের সোনালি যুগের ক্রিয়াকর্ম বা বক্তব্য দ্বারাই নির্ণিত হতে পারে। অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অধুনা প্রচলিত ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন শরীয়তে কোনোভাবেই অনুমোদিত নয়। আমরা নবীজির জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর আদর্শময় জীবন নিয়ে যেকোনো সময় আলোচনা অনুষ্ঠান করতে পারি; তা বরং উত্তম হবে। রবিউল আউয়ালের দ্বাদশ তারিখকে ঈদ ঘোষণা দিয়ে শরীয়তে নতুন প্রথা চালু করার দুঃসাহস কারো নেই।

শাফেয়ী ফিকহ মতাবলম্বী ইমাম নাসিরুদ্দিন ইরশাদুল আখইয়ার নামক গ্রন্থের ২০ নং পৃষ্ঠায় এবং হানাফী ফিকহের অনুসারী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. স্বীয় মাকতুবাতের ৫ম খণ্ডের ২২ নং পৃষ্ঠায় লিখেন,

'যে সমস্ত বিদআতকে লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের নিদর্শন বা কৃষ্টি মনে করে থাকে, তন্মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসে পালিত মিলাদ অনুষ্ঠানও একটি। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, উক্ত অনুষ্ঠানটি বেশ

কিছু আপত্তিকর ক্রিয়াকর্মের সংযোগে পালিত হয়। যেমন সামআ বা বাদ্যের ব্যবহার। আর যদি তাতে সামআ বা বাদ্য প্রভৃতি না-ও থাকে এবং নিরেট জন্মদিন উপলক্ষ্যে (মৌলুদে) আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনদের জন্য শুধু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তবুও মিলাদ উপলক্ষ্যে পালন করার দরুন তা বিদআত বলে গণ্য হবে। কেননা আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ এমনটি করেছেন বলে প্রমাণ নেই। অথচ তাঁদের পথ অনুসরণ করে চলাই অধিক মঙ্গলজনক।' (মাদখাল ইবনুল হাজ্জ : ১/৮৫)

প্রচলিত মিলাদের গোড়ার কথা

প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল না। এমনকি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্তও এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী, মুহাদ্দিস, ইমাম বা ফকীহ এ প্রথা চালু করেছেন বলে প্রমাণ নেই। সর্বপ্রথম এ প্রথাটি চালু করে অপব্যয়ী বাদশাহ মুযাফফর উদ্দিন আবূ সাঈদ কাওকারী এবং তার বন্ধু মৌলভি ওমর ইবনে অহিয়া আবুল খাত্তাব। হিজরী ৬০৪ সনে এক নির্দেশনামা জারির মাধ্যমে ইরাকের আরবাল শহরে তারা এর সূচনা করে। এ অপচয়কারী বাদশাহ রাষ্ট্রীয় কোশাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে মিলাদ মাহফিল করত। সাধারণ প্রজাদের ধর্মীয় চেতনাকে পুঁজি করে সে তার দল ভারী করত। আর তার এ কাজে বিশেষ সহযোগিতা দিয়েছিল তার মৌলভি বন্ধু ওমর ইবনে অহিয়া আবুল খাত্তাব। সে মিলাদ অনুষ্ঠানের লাভ বর্ণনা করে একটি পুস্তিকাও রচনা করে। বাদশাহ এর জন্য তাকে পুরস্কারস্বরূপ এক হাজার দিনার প্রদান করে। উক্ত মৌলভির পরিচয় দিতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লেখেন,

كثير الوقيقه فى الائمة وفى السلف من العلماء خبيث اللسان
احمق شديد الكبر قليل النظر في امور الدين متهاونا

'মাযহাবের ইমাম এবং বরেণ্য উলামায়ে কেরাম সম্পর্কেও সে ধৃষ্টতাপূর্ণ, বেয়াদবীমূলক উক্তি করত। সে চরম দাম্ভিক, বোকা ও কটুভাষী ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত উদাসীন।'

আল্লামা ইবনে নাজ্জার বলেন,

قال ابن النجار رأيت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه

'সকল মানুষই তাকে মিথ্যাবাদী ও দুর্বল মনে করত।' (লিসানুল মীযান : ৪/২৯৫)

বাদশাহ মুযাফফর উদ্দিন আবূ সাঈদ কাওকারী সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের খ্যাতনামা ইমাম আল্লামা আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. লেখেন,

'সে ছিল এক অপব্যয়ী বাদশাহ। সমকালীন আলেমদের প্রতি সে এ মর্মে নির্দেশ জারি করত যে, তাঁরা যেন স্ব স্ব ইস্তেম্বাত ও ইজতেহাদ মোতাবেক আমল করেন এবং কোনো মাযহাবের অনুসরণ না করেন। একপর্যায়ে সে এক শ্রেণির লোভী আলেম ও বুদ্ধিজীবিকে নিজ দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়। প্রতি বছর রবিউল আউয়ালে সে ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করত। ইতিপূর্বে এই বিদআতের প্রচলন ছিল না। সে-ই সর্বপ্রথম তা উদ্ভাবন করে।' (আল কাউলুল মু'তামাদ ফী আমালিল মাউলিদ)

আমরা এ সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত থেকে বুঝতে পারলাম, অতি চতুরতার সাথে মুসলিম সমাজে এ প্রথাটির প্রচলন ঘটানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা একটিবারও ভাবছি না যে, সাহাবায়ে কেরাম যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার সবচেয়ে বড় দাবিদার ছিলেন বা তাবেয়ীগণ যেখানে দ্বীনের বেশি সমঝদার ছিলেন, তাঁরা যখন এজাতীয় মিলাদ মাহফিল করেননি, তাহলে আমরা কেন এ নিয়ে মেতে উঠেছি? আমরা কি তাদের থেকে বেশি বোদ্ধা বা নবীপ্রেমিক হয়ে গেলাম?

আমরা যদি মিলাদ মাহফিলে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব, সেখানে কিয়ামের মাধ্যমে নবীজিকে সম্মান জানানো হয়। মিলাদে অংশগ্রহণকারী একদল লোকের ধারণা হলো, এ মোবারক মাহফিলে নবীজি সশরীরে তাদের মাঝে উপস্থিত হন। এজন্য অনেকে একটি খালি চেয়ারও রেখে দেন (নাউযুবিল্লাহ)।

মিলাদে কিয়ামের এ সংযোজন হয় ৭৫৫ হিজরী সনে অর্থাৎ মিলাদ আবিষ্কারের দেড়শ বছর পর। খাজা তকী উদ্দিন সুবকী রহ.-এর দরবারে জনৈক কবি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে প্রশংসা কাব্য

পাঠ করলে খাজা সাহেব নবীপ্রেমে গভীর আসক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। এটা ছিল নিছক তাঁর ব্যক্তিগত একটি ভাবের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তাঁর সহাবস্থানের আদব রক্ষার্থে উপস্থিত তাঁর ভক্তগণও দাঁড়িয়ে যায়। এটা কোনো মিলাদ মাহফিল ছিল না। তাই এ ঘটনাটিকে যারা মিলাদে কিয়াম করার বৈধতার প্রমাণ বলে চালিয়ে দিতে চায়, তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, শরীয়ত কোনো বুযুর্গের ব্যক্তিগত আমলের নাম নয়; শরীয়ত হলো আল্লাহ কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নির্দেশিত মত ও পথের নাম। তাই কারো ব্যক্তিগত আমল দিয়ে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

এখন কথা হলো, প্রচলিত মিলাদ—শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই, সেখানে নবীজিকে হাজির-নাজির মনে করে কিয়াম করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? এ ব্যাপারে আমরা সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতামত যাচাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

হযরত আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

> لَمْ يَكُن شَخْص أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَةِ لِذٰلِكَ
>
> ‘সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তি অন্য কেউ ছিলেন না। নবীজি তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে দণ্ডায়মান হওয়াকে অপছন্দ করতেন, তাই তাঁরা তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না।’ (তিরমিযী : ২/১০০; মুসনাদে আহমাদ : ৩/১৫১)

অতএব, বুঝা গেল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্মানার্থে কারো দাঁড়ানোকে খুব অপছন্দ করতেন। আর এ কারণেই হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. তাঁর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসায় বিভোর থাকার পরও তাঁর আগমনে কিয়াম করতেন না। ভাবতেও অবাক লাগে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে কিয়াম পছন্দ করেননি এবং যার ফলশ্রুতিতে নবীপ্রেমের মূর্ত প্রতীক সাহাবায়ে কেরাম তা থেকে বিরত রইলেন, আজ কোন যুক্তিবলে মিলাদের অনুষ্ঠানে সে কিয়াম পছন্দনীয় হয়ে

গেল? উপরন্তু মিলাদ অনুষ্ঠানে নবীজির উপস্থিত হওয়া কিংবা তিনি কারো দৃষ্টিগোচর হওয়ার সপক্ষে যখন নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল নেই, তখন মুস্তাহাব তো দূরের কথা—একে জায়েয বলারই কোনো অবকাশ নেই। অথচ কেউ কেউ কিয়াম করাকে ওয়াজিব ও ফরয বলতে এবং যারা তা করেন না তাদেরকে কাফের আখ্যা দিতে পর্যন্ত দ্বিধা করে না।

অনেকে বলে থাকেন, মিলাদ মাহফিলে তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন নিয়ে আলোচনা ও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয়, তাহলে এতে অসুবিধা কোথায়?

এর জবাবে বলা যায়—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আলোচনা এক জিনিস এবং মিলাদ মাহফিল ভিন্ন জিনিস। আর মিলাদে কিয়াম করাও অন্য জিনিস। তিনটিকে এক ও অভিন্ন জ্ঞান করা মারাত্মক ভুল। মূলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আলোচনা করা উত্তম ও সাওয়াবের কাজ। এতে শরীয়তের বাধা তখনই আসতে পারে, যখন এতে নিজের পক্ষ হতে আবিস্কৃত শর্ত সংযোজন করা হয়। আর মানবরচিত শর্ত বিদআত। যেমন, মিলাদের জন্য রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ ধার্য করা। তদ্রূপ দরূদ শরীফ ও মিলাদকে এক জিনিস মনে করাও নিছক মূর্খতা। দরূদ শরীফ জীবনে একবার হলেও পাঠ করা ফরয। দরূদ শরীফ বেশি বেশি পাঠ করা সাওয়াব ও বরকতের আমল। স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। তিনি দরূদ শরীফ পরিত্যাগকারীর নিন্দা করেছেন, কিন্তু প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের বিষয়ে হাদীসে কিছুই উল্লেখ নেই। না এর ফযীলত সম্পর্কে কিছু বর্ণিত আছে, না এর ভাষা ও বর্ণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। তাই এ পদ্ধতি সম্পূর্ণই বিদআত।

ওরস উদ্‌যাপন

‘ওরস’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো طعام الوليمة আমাদের দেশে ‘ওরস’ বলতে কোনো বুযুর্গের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতি বছর নির্দিষ্ট তারিখে তার কবরে সমবেত হওয়া ও মেলার আয়োজন করাকে বোঝায়।

পীর-মাশায়েখদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা রাখা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়

কাজ। এই হৃদ্যতা মূলত আল্লাহর প্রতি ভালোবাসারই নামান্তর। তাঁদের দিক-নির্দেশনা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা। তাঁদের ইন্তেকালের পর শরীয়তসম্মত পন্থায় তাঁদের জন্য ঈসালে সাওয়াব করতে বা তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে কোনো আপত্তি নেই। তবে কবর যিয়ারতের জন্য মাহফিল করা অর্থাৎ দিন-তারিখ ধার্য করে ওরস উদযাপন করা আদৌ শরীয়তসম্মত নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا

'তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত কোরো না।' (নাসায়ী)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. লেখেন, নবীজির এ বাণীর মূল ভাবধারা হলো, অধিকহারে কবর যিয়ারতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। যেন লোকজন ঈদের ন্যায় কবর যিয়ারত বার্ষিক প্রোগ্রামে পরিণত করে না ফেলে।

ওরস বছরের নির্দিষ্ট একটি তারিখে ঈদের মতো খুব জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। যা উক্ত হাদীস দ্বারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট এ জাতীয় ওরস ও মেলা করা যখন বৈধ নয়, তখন অন্য কারো কবরের পাশে এমনটি করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ আলেম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় লেখেন, 'তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত কোরো না।'—এই নির্দেশনামা দ্বারা 'তাহরীফ' তথা ইসলামের মধ্যে বিকৃতি আনয়নের পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়াই হচ্ছে নবীজির উদ্দেশ্য। কেননা ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা পূর্ববর্তী নবীগণের কবরসমূহকে হজ্জের ন্যায় বার্ষিক উৎসব কেন্দ্রে পরিণত করে তাদের ধর্মকে বিকৃত করেছিল। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা : ২/৭৭)

অতএব বুঝা গেল, যেভাবে প্রতিবছর একই সময়ে মহা সমারোহে হজ্ব পালিত হয়, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ঠিক সেভাবে প্রতি বছর তাদের নবীগণের মাজারে জমায়েত হয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উৎসব পালন করত। বলা বাহুল্য,

তারা তো তাদের নবীগণের মাজারে শুধু উৎসব করত। কিন্তু এ যুগের নামধারী মুসলমানরা পীর-বুযুর্গদের মাজারে এমন সব কার্যকলাপ করছে, যা দেখে স্বয়ং ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও লজ্জায় মস্তক অবনত করে।

আজকাল দেখা যায়—কোনো পীর-ফকীর মারা গেলে তার ওফাত দিবসকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে মদ-গাঁজাসহ শরীয়ত বিরোধী নানা কার্যকলাপ হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক লোক এটিকে পুণ্যের কাজ মনে করেন। অনেকে আবার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার আশায় সেখানে গিয়ে দোয়া করেন। শরীয়তে এ কাজের কোনো ভিত্তি নেই। এটি পরবর্তী লোকদের উদ্ভাবন ও বিদআত। তদুপরি তা পূর্বসূরিদের রীতির পরিপন্থি। সাহাবায়ে কেরাম রা. কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজার শরীফের পাশে গিয়ে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করেছেন বলে প্রমাণ নেই।

আল্লাহ তাআলা ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

> ‘তাদের জনসাধারণ আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে তাদের বুযুর্গদেরকে সংবিধানদাতা ও সমস্যা সমাধানকারী বানিয়ে নিয়েছে।’

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন, ‘যদি কেউ বরকত অর্জন ও দোয়া কবুলের আশায় কবরের পাশে গিয়ে নামায পড়ে কিংবা নিজের প্রয়োজন ও সমস্যার জন্য দোয়া করে, তা হবে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহের নামান্তর এবং দ্বীন ও শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের শামিল। অধিকন্তু তা দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সংযোজন, যা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং সত্যানুসারী ইমামগণের কেউ অনুমতি দেননি।’

দুঃখজনক হলেও সত্য, এই ওরসকে কেন্দ্র করে অনেক শিরকী কাজ হয়ে থাকে। যেমন অনেকে পীরের নামে বিভিন্ন জীবজন্তু মানত করে ওরসের সময় তা নিয়ে আসে এবং পীরের নামে জবেহ করে তবারক হিসেবে তা বিতরণ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কিছু মানত করা যেমন শিরকী কাজ, তদ্রূপ তা পীর-ফকীরের নামে জবেহ করাও হারাম। আর

শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো খাওয়া হারাম। তাই আমরা মুসলিম উম্মাহ আজ কোন পথে যাচ্ছি, তা একটু ভেবে দেখা উচিত।

ওরসের নামে আমরা যা কিছু করছি তা নিজেদের স্বার্থে, এতে পীরের কোনো উপকার নেই। পীর এসে আমাদের এ নেয়াজ ভোগ করেন না। সমাজের চতুর কিছু লোক আছে, যারা এ জাতীয় অনুষ্ঠান করে থাকে, যেন নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা হয়। আজকাল ওরসের নামে কত চাঁদাবাজি হচ্ছে! সরলমনা লোকগুলো তাদের কষ্টার্জিত পয়সা এনে ওই স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে দিচ্ছে, আর তারা তা দিয়ে নিজেদের পেট চালাচ্ছে। এ বিষয়ে সচেতনতা না এলে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

সম্মানবশত কবর পাকা করা

কবরের উপরিভাগ চুন-সুরকি দিয়ে পাকা করা কিংবা মাটির লেপ দেওয়া জায়েয নয়। এ কাজ মাকরূহে তাহরীমী ও বিদআত। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ

‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুন-সুরকি দ্বারা কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন।’ (মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয)

কবর যেভাবে থাকে, সেভাবেই রেখে দেওয়া উচিত। তবে নিতান্তই প্রয়োজন হলে যেমন ভেতরের মাটি অত্যন্ত নরম হলে কাঁচা ইট দ্বারা দেয়াল মজবুত করতে এবং কোনো প্রাণীর গোর খননের আশঙ্কা থাকলে চারপাশে বাউন্ডারি করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সম্মানবশত কোনোভাবেই পাকা করা যাবে না।

কোথাও দেখা যায়, কবরপৃষ্ঠ মার্বেল পাথর অথবা কাঠের তক্তা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। আবার চতুর্পার্শে লোহার রেলিং দেওয়া হয়। এমন কাজের কোনো ভিত্তি নেই। এটি পরবর্তীকালের লোকদের উদ্ভাবন ও বিদআত। তদুপরি এতে সম্পদের অপচয় করা হয় এবং বড়োত্ব প্রকাশ পায়।

আজকাল কিছু কিছু বুযুর্গ এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিদের কবরের উপর সৌধ বা গম্বুজ নির্মাণ করতে দেখা যায়। এটাও গর্হিত

কাজ। অনেকের মতে হারাম। বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আবূ সাঈদ আল-খাদেমী রহ. (মৃত্যু ১১৭৬ হি.) বলেন, 'কবরের উপর যেকোনো ইমারত তৈরি করা এবং কবর সুসজ্জিত করা একটি বড় বিদআত ও গর্হিত কাজ।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে বিপুলসংখ্যক মানুষকে দাফন করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর প্রিয়তম সন্তানগণ, আত্মীয়গণ, উম্মতের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামের অনেকে। তিনি কারো কবরে কখনো কোনো গম্বুজ তৈরি করেননি, পাকা করেননি, কোনো প্রকারের চুনকাম বা সযত্ন সংরক্ষণ করেননি। সর্বদা তাঁদেরকে কবরস্থানে দাফন করতেন। কখনো কখনো বিশেষ আপনজন ও বিশেষ ভালোবাসার মানুষের জন্য কবরস্থানের অগণিত কবরের মধ্য থেকে তাঁদের কবর চিনতে পারার জন্য পাশে পাথর রেখে দিতেন।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই উসমান ইবনে মাযউন রা. সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁকে কবরস্থানে নিয়ে দাফন করা হলো। দাফন শেষে নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনতে বললেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি পাথরটি বহনে সক্ষম হচ্ছিল না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার আস্তিন গুটিয়ে পাথরটি বহন করে নিয়ে তাঁর দুধ ভাইয়ের শিয়রের কাছে রাখলেন এবং বললেন, এই পাথরটি দিয়ে আমার ভাইয়ের কবর আমি চিনতে পারব এবং আমার পরিবার-পরিজনের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে তার পাশে দাফন করব।' (আবূ দাউদ, কিতাবুল জানায়েয)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে তাঁর প্রিয়তম ভাই, এত বড় বুযুর্গ সাহাবী ও আল্লাহর অন্যতম ওলির কবরটি বাঁধাতে বা কবরের উপর একটি ঘর ও যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য একটি ছাউনি নির্মাণ করতে পারতেন। তিনি তা করতে চাইলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করতেন এবং নিজেরাও তাঁর এই সুন্নাত অনুসরণ করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এই অপ্রয়োজনীয় আমল না শিখিয়ে শুধু পাথর রেখে তা চেনার একটি পন্থা বাতলে দিলেন। কিন্তু আজকাল আমরা মাজার তৈরির নামে যা করছি, তা

সম্পূর্ণ নববী তরীকার খেলাফ। শুধু তা-ই নয়, এগুলো রীতিমতো ইসলাম বিরোধী কাজ।

কেউ কেউ বলেন, যদি মৃত ব্যক্তি কোনো বিশিষ্ট বুযুর্গ হন, তাহলে যিয়ারতকারীদের সুবিধার্থে তাঁর কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করতে অসুবিধা নেই। এটা অমূলক একটি যুক্তি, শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই, অধিকন্তু এটি মনগড়া ও দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন। আর যদি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায় ও পূজা আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার আলামত মুছে ফেলাও উচিত।

হযরত আবুল আলিয়্যাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হযরত উমর রা.-এর খেলাফতের আমলে আমরা তাস্তুর বিজয় করার পর হরমুযানের কোষাগারে একটি খাটিয়া দেখতে পেলাম। সেখানে একটি শবদেহ এবং তার মাথার পাশে মুসহাফ (ধর্মীয় গ্রন্থ) ছিল। আমরা মুসহাফটি হযরত উমর রা.-এর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি হযরত কাব রা.-কে ডেকে পাঠালেন। কাব রা. এসে আরবিতে এর একটি অনুলিপি তৈরি করলেন। আবুল আলিয়্যাহ রহ. বলেন, আমিই সর্বপ্রথম আরবদের মাঝে এ অনুলিপিটি পড়লাম। রাবী আবূ খালদাহ রহ. বলেন, আমি আবুল আলিয়্যাহ রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, সেখানে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে? আবুল আলিয়্যাহ রহ. বললেন, তোমাদের নীতি-আদর্শ, আচারব্যবহার ও ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আবূ খালদাহ রহ. পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, খাটিয়ার মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকদের ধারণা কী ছিল? আবুল আলিয়্যাহ রহ. বললেন, লোকটি সম্পর্কে তাদের ধারণা হলো, এটি হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালামের মৃতদেহ। আবূ খালদাহ রহ. আবার জিজ্ঞেস করলেন, কত বছর পূর্বে তারা তাঁকে পেয়েছিল? আবুল আলিয়্যাহ রহ. বললেন, তিনশ বছর পূর্বে। আবূ খালদাহ রহ. আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর দেহের কোনো অংশে কি কোনো পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল? আবুল আলিয়্যাহ রহ. জবাব দিলেন, না; তবে পিঠের দিকের কিছু লোমের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। নবী-রাসূলগণের দেহ মৃত্যুর পরেও অক্ষুণ্ন থাকে, না মাটি তাকে জরাজীর্ণ করতে পারে, না কোনো হিংস্র প্রাণী তাকে গ্রাস করতে পারে। আবূ খালদাহ রহ. আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা তাঁর

নিকট থেকে কী আশা করত? আবুল আলিয়্যাহ রহ. বললেন, যখন অনাবৃষ্টি দেখা দিত, তখন লোকেরা তাঁর খাটিয়াটি বাইরে বের করত। এর ফলে বৃষ্টিপাত হতো। আবূ খালদাহ রহ. আবার জানতে চাইলেন, এটি আপনাদের হস্তগত হওয়ার পর এ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আপনারা কী করলেন? তখন আবুল আলিয়্যাহ রহ. বললেন, আমরা দিনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে তেরোটি কবর খনন করলাম। রাত হওয়ার পর আমরা তাঁকে একটি কবরে দাফন করলাম। অতঃপর খননকৃত কবরগুলোর প্রত্যেকটি সমান করে দিলাম। যাতে আমরা লোকদের কাছে তাঁর কবরের পরিচয় অজ্ঞাত রাখতে পারি। তারা যেন খনন করে তাঁকে বের করে আনতে না পারে। (ইবনু ইসহাক, আস-সীরাতুন নাববীয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ১৭; কাছাছুল আম্বিয়া : ২/৩৩১)

প্রিয় পাঠক, লক্ষ করুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবীগণ হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালামের কবরকে অজ্ঞাত রাখার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আর এর পেছনে তাদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল, যাতে এ কবর নিয়ে লোকেরা গোমরাহীতে লিপ্ত হতে না পারে। চিন্তা করুন! এ কবরের পার্শ্বে বসে দোয়া করার উদ্দেশ্যে কিংবা উক্ত কবর থেকে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে সাহাবীগণ উক্ত কবরের কোনো আলামত অবশিষ্ট রাখেননি। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো, বর্তমানে এরূপ কোনো কবরের সন্ধান পাওয়া গেলে অনেকেই তাকে রক্ষা করার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হতো না। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলত সুরম্য দরগাহ এবং সেখানে তারা হাজত পূরণের উদ্দেশ্যে নযর পেশ করত। আর হয়তো একদিন তাকে বিশাল মেলার স্থানে পরিণত করে ফেলত। আল্লাহ আমাদেরকে এসব অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার তাওফিক দিন।

কবরে বাতি জ্বালানো, গেলাফ চড়ানো ও ফুল দেওয়া

কবরকে সুসজ্জিত করার কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই। এটি নিছক নতুন উদ্ভাবিত একটি বিষয়। আজকাল কবরকে কেন্দ্র করে যে আলোকসজ্জা ও মোমবাতি জ্বালানো হয়, শরীয়তে তারও কোনো ভিত্তি নেই; বরং শরীয়তে এর কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

'কবর ও মাজারে গমনকারী নারীদের প্রতি এবং যারা সেখানে সিজদা করে ও আলো জ্বালায় তাদের সকলের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন।' (আবূ দাউদ : ২/১৫৭)

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের জন্য নিন্দা ব্যক্ত করেছেন, তা বৈধ হবে?

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকাল প্রতিযোগিতার সাথে কবরে প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং যুক্তি পেশ করা হয়, এতে নাকি পীর-আউলিয়াদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছাড়াও পথিকদের পথ চলার এবং কোরআন তেলাওয়াতকারীদের জন্য সুবিধাসহ আরও অনেক কল্যাণ রয়েছে। আমরা নিঃসঙ্কোচে জোর গলায় বলতে চাই, আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে যদি হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভর্ৎসনায় পড়তে হয়, তবে এরকম সম্মান ও ভালোবাসা দেখাবার কী মূল্য আছে? আমাদের তা দরকার নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই ওলী-বুযুর্গদের প্রতি ঢের সম্মান রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যুম রহ. লেখেন,

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا

'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করতে ও দীপশিখা জ্বালাতে নিষেধ করেছেন।' (যাদুল মাআদ : ১/৪৬)

আউলিয়ায়ে কেরামের কবরে আজকাল কারুকার্য খচিত গেলাফ চড়ানো হয়ে থাকে এবং ফুল ছড়ানো হয়ে থাকে। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনগণ এবং ইসলামের স্বর্ণযুগের কেউ কোনো পীর-বুযুর্গের কবরে গেলাফ পরিয়েছেন, ফুল বা পুষ্পমাল্য অর্পণ

করেছেন, এ ধরনের কোনো প্রমাণ নেই। অথচ বর্তমানে যারা এমনটি করেন, তারা শুধু একে জায়েযই মনে করেন না; বরং সাওয়াবের কাজ মনে করছেন। তাদের কেউ কেউ যুক্তি পেশ করে থাকেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বয়ং কবরে খেজুরের ডাল স্থাপন করেছেন, আর এতে তো তিনি আযাব লাঘবের আশা করেছেন। তাহলে কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করায় আপত্তি কোথায়?

এর জবাব হলো, এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত নিজস্ব আমল। অন্য কারো জন্য এরূপ করা সমীচীন নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন, কবরে তাদের উপর আযাব হচ্ছে। সাথে তাঁকে এটাও জানানো হয়েছিল যে, তাঁর পবিত্র হাতে গাছের ডাল স্থাপনের ফলে তাদের আযাব কিছুটা হ্রাস পাবে। কিন্তু তিনি ছাড়া অপর কেউ না কোনো কবরবাসীর আযাবের ব্যাপারে জানতে পারবে, না তার কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি আসবে। তাই অন্যদের জন্য কবরে গাছের ডাল স্থাপন বৈধ নয়। এ ছাড়া কারো কবরে গাছের ডাল স্থাপন করে এ কথা প্রমাণ করার সুযোগ নেই যে, ওই কবরে আযাব হচ্ছে।

পুরো হাদীসের সম্ভার থেকে শুধু একবারই জানা যায় যে, নবীজি কবরের উপর এরূপ ডাল স্থাপন করেছেন। এ ঘটনা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কারো কবরে ডাল স্থাপন করেছেন মর্মে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না এবং এ ব্যাপারে কাউকে তিনি কোনো নির্দেশও দিয়ে যাননি। তাই এর দ্বারা কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করার কোনো যুক্তি হতে পারে না। যদি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন বা তাবে তাবেয়ীদের থেকে এরূপ প্রচলন থাকত, তাহলেও তা করায় আমাদের আপত্তি ছিল না। অতএব, কোনো অজুহাতেই আমরা এ বিদআত রুসম চালু করতে পারি না। আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন।

জানাযার নামাযের পর দোয়া

কোনো মুসলমানের মৃত্যুর পর তার জন্য উত্তম উপহার হলো দোয়া। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন যেকোনো সময় ব্যক্তিগতভাবে দোয়া

করতে পারে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। শরয়ী দলীল দ্বারা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সম্মিলিতভাবে জামাতের সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার প্রমাণ কেবল জানাযার নামাযের নিয়মে ও কবরে দাফন করার পর শরয়ী নিয়মে তালকীনের পদ্ধতিতে ছাড়া পাওয়া যায় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তায়েয়ীন ও তাবে তাবেয়ীগণ একটি-দুটি নয়; বরং লক্ষ লক্ষ জানাযা পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন। কিন্তু কারো থেকে এটা প্রমাণ নেই যে, তাঁরা জানাযার নামায সমাপ্ত করে একাকী বা সম্মিলিতভাবে আবার দোয়া করেছেন। মৃত ব্যক্তির জন্য সাধারণত দোয়া করা যায় বা করা দরকার এই সূত্র ধরে যারা সমবেত হয়ে দোয়া করা কিংবা সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই দোয়া করা বৈধ বলে দাবি করেন, তারা আর যাই হোক শরীয়ত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখেন না।

শামসুল আইম্মা আল্লামা সারাখসী রহ. উল্লেখ করেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ السَّيْفُ مَحَّاءٌ لِذُنُبِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى شَفَاعَةٍ لَهُ وَدُعَاءٌ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তলোয়ার (শাহাদাতবরণ) পাপ মোচনকারী এবং জানাযার নামায তার জন্য সুপারিশ ও দোয়াস্বরূপ।'

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, জানাযার নামায মানেই দোয়া। জানাযার পর দ্বিতীয়বার আবার দোয়ার প্রয়োজন নেই।

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ মোল্লা আলী কারী উক্ত হাদীসের টিকায় লেখেন,

وَلَا يَدْعُوْ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوْهٌ.

'জানাযার নামায শেষে দোয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকবে না।' (ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া, পৃষ্ঠা : ২৩)

ইমাম হাফিজ উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব কিরদারী হানাফী রহ. বলেন,

لَا يَقُوْمُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ مَرَّةً

'জানাযার নামাযের পর দোয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না। কেননা সে জানাযার নামাযের মাধ্যমে সবেমাত্র একবার দোয়া করল।' (ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়া : ১/২৮)

সকল ইমাম ও নির্ভরযোগ্য উলামাগণ জানাযার নামাযের পর দোয়া করাকে মাকরূহ ও দ্বীনের নামে নতুন সংযোজন বলে উল্লেখ করেছেন। তাই এই নব আবিষ্কার সকলের পরিত্যাগ করা উচিত।

শরীয়তে প্রত্যেকটি কাজ করার জন্য নিয়ম রয়েছে। যেমন মুর্দাকে জানাযার পর দাফন করে তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো রীতি। কিন্তু আমরা যদি এর বিপরীতে জানাযার নামাযের পরেই দোয়া সেরে ফেলি, তাহলে তা হবে খেলাফে সুন্নাত বা বিদআত। অতএব, এ বিষয়টি সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

আবূ দাউদ শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত উসমান ইবনে মাজউন রা.-কে যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাফন করলেন, তখন তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন এবং লোকদেরকে বলেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং অটল থাকার জন্য দোয়া করো।'

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, দাফনের পর দোয়া করতে হবে, জানাযার পর নয়।

ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ ও পারিশ্রমিক গ্রহণ

মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করে কোরআন তেলাওয়াত করা এবং তেলাওয়াতের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করায় শরীয়তে কোনো আপত্তি নেই; বরং এটা উত্তম। কিন্তু বর্তমানে সাধারণত মৃত ব্যক্তির প্রতি সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে খতমে কোরআন একটি নতুন উদ্ভাবন ও বিদআত। বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু আবেদীন রহ. বলেন,

وَيُكْرَهُ وَاتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَجَمْعُ الصُّلَحَاءِ وَالْقُرَّاءِ لِلْخَتْمِ أَوْ لِقِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ أَوِ الْاِخْلَاصِ

'মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন পাঠের দাওয়াতের ব্যবস্থা করা এবং খতমে কোরআন কিংবা সূরা আনআম বা সূরা ইখলাস

পড়ার জন্য সাধু-সজ্জন ও কারীদের সমবেত করা মাকরূহ।' (রদ্দুল মুহতার : ৬/৩৯৪)

আজকাল কোথাও কোথাও দেখা যায়, মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে বা মহল্লার মসজিদে আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-মিসকিন সমবেত হয়ে কোরআন পাঠ ও খতমে তাহলীল করে এবং এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো হয়। আবার কোনো কোনো এলাকায় লক্ষ্য করা যায়, মৃত্যুর পর দশ দিন পর্যন্ত, অথবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কিছু অর্থকড়ি দিয়ে হাফেজে কোরআনের মাধ্যমে কবরস্থানে বা নিজের ঘরে কোরআন পড়ানোর রেওয়াজ রয়েছে। অনেকেই এ কাজকে জায়েয বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভাবন ও বিদআত। সাওয়াবের চেয়ে এতে গোনাহের আশঙ্কাই রয়েছে বেশি।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, যারা এভাবে খতমে কোরআন করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, তারা উদরে আগুনই পূর্ণ করছেন।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আল্লামা সদরুদ্দিন ইবনু আবিল ইয্‌য রহ. বলেন,

وَأَمَّا اسْتِئْجَارُ قَوْمٍ يَقْرَئُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَهْدُوْنَهُ لِلْمَيِّتِ فَهٰذَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّلَفِ وَلَا أَمَرَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ وَلَا رَخَّصَ فِيْهِ.

'কোরআন পড়ে এবং তার সাওয়াব মৃতদের উদ্দেশ্যে বখশিয়ে দিয়ে পারিশ্রমিক চাওয়া (এতই নিন্দনীয় যে) সালফে সালেহীনদের কেউ করেননি এবং দ্বীনের কোনো ইমাম এ কাজ করতে বলেননি। তদুপরি তাঁদের কেউ এরূপ কাজ করার অনুমতিও দেননি।' (শরহুল আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ, ৩/১০৮)

তাজুশ শরীয়ত মাহমুদ ইবনে আহমাদ রহ. স্পষ্ট বলেন,

إِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْأُجْرَةِ الثَّوَابَ لَا لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْقَارِيْ

'বিনিময় নিয়ে যে কোরআনপাঠ করা হয়, এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তি এবং পাঠক কেউই পায় না।' (আনোয়ারে সাতিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১০৭)

আল্লামা আইনী হানাফী রহ. লেখেন,

اَلْأَخْذُ وَالْمُعْطِيْ إِثْمَانِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا شَاعَ فِيْ زَمَانِنَا مِنْ قِرْأَةِ الْأَجْزَاءِ بِالْأُجْرَةِ لَا يَجُوْزُ

‘কোরআনপাঠের পারিশ্রমিক থেকে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই সমানভাবে গোনাহের ভাগীদার হয়। বর্তমানে অর্থের বিনিময়ে কোরআন শরীফ পড়ার যে প্রথা চালু হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নাজায়েয।’ (বেনায়া শরহে হেদায়া, ৩/৬৫৫)

মৃত ব্যক্তির ঘরে জিয়াফত খাওয়া

হাদীস ও ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে, মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন যেহেতু শোকে কাতর থাকে, তাই প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের নৈতিক দায়িত্ব তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা। জানাযার নামাযে যে ব্যক্তি উপস্থিত হতে পারেনি, সেও সমবেদনা জ্ঞাপন করার অধিকার রাখে। তবে মৃতের ঘরে জিয়াফত খাওয়ার উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া এবং পরিবারের লোকজনদের সেই জিয়াফতের আয়োজন করা খুবই জঘন্য রীতি। এটা অমানবিকও বটে। অনেক সময় দেখা যায়, নিজের টাকা-পয়সা নেই, তবুও রেওয়াজ মতো এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে তাই সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। কোনো কোনো পরিবারকে এজন্য চাঁদা সংগ্রহ ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতেও দেখা যায়।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا نَرٰى الْاِجْتِمَاعَ إِلٰى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةُ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ

‘আমরা মৃতের ঘরে জিয়াফত খাওয়ার উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়াকে বিলাপতুল্য মনে করতাম।’ (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা : ১১৭)

ফলে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, হযরত সাহাবায়ে কেরামের নিকট মৃতের ঘরে একত্রিত হওয়া, খাওয়া-দাওয়া করা ইত্যাদি শোক বিলাপের মতো হারাম। এককথায়, এই সমবেত খাবারের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ শোক বিলাপের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা ইবনে আমীরুল হাজ্জ মালেকী রহ. লেখেন,

وَأَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْقَلْ فِيْهِ شَيْءٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ

‘মৃতের পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করা এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের নিকট লোকদের সমবেত হওয়া হাদীসে নেই। এটি বিদআত; মুস্তাহাব নয়।’ (মাদখাল : ৩/৪৪১)

ইবনুল হুমাম ও ইবনুল আবেদীন রহ. প্রমুখ হানাফী ফকীহগণ বলেন,

وَيُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِيْ السُّرُوْرِ لَا فِيْ الشُّرُوْرِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ

‘মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে জেয়াফতের আয়োজন করা মাকরূহ। কেননা জেয়াফতের বিধান খুশির সময়ের জন্য; বিপদ মুহূর্তের জন্য নয়। এটি একটি নিন্দনীয় বিদআত।’ (ফাতহুল কাদীর : ৩/৪৩২; রদ্দুল মুহতার : ৬/৩৯৪)

ইবনু কুদামাহ আল-হাম্বলী রহ. বলেন,

فَأَمَّا صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ فَمَكْرُوْهٌ لِأَنَّ فِيْهِ زِيَادَةً عَلٰى مُصِيْبَتِهِمْ وَشُغْلًا لَهُمْ إِلٰى شُغْلِهِمْ وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

‘লোকদের জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে খাবারের আয়োজন করা মাকরূহ। কেননা তা প্রকারান্তরে তাদের জন্য মরার উপর খাঁড়ার ঘা ও ব্যস্ততার উপর ব্যস্ততার। উপরন্তু তা জাহেলি রীতির অনুকরণও।’ (আল-মুগনী : ৫/৪৮)

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

وَاصْطِنَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ الطَّعَامَ لِأَجْلِ اِجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوْهَةٌ

‘সমবেত লোকদের জন্য মৃতের পরিবারের খাবারের আয়োজন করা একটি নিন্দনীয় বিদআত।’ (তুহফাতুল আহওয়াযী : ৩/৩৫৪)

ইমাম কাজীখান রহ. লেখেন,

وَيُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِيْ أَيَّامِ الْمُصِيْبَةِ لِأَنَّهَا أَيَّامُ تَأَسُفٍ فَلَا يَلِيْقُ بِهَا مَا كَانَ لِلسُّرُوْرِ

'বিপদের দিন জিয়াফত করা মাকরূহ। কারণ শোকাবহ মুহূর্তে আনন্দ উল্লাস শোভনীয় নয়।' (ফাতাওয়ায়ে খানিয়া : ৪/৪৮১)

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. লেখেন, 'মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একত্রিত হওয়া, কুলখানি এবং কবরের পাশে কোরআন খতম করা ইত্যাকার কর্মকাণ্ড পূর্বে ছিল না। এ সবই বিদআত। হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও তাদের সান্তনা দেওয়ার জন্য সমবেত হওয়া এবং ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া সুন্নাত ও মুস্তাহাব।'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আজকাল আমাদের সমাজে মৃত ব্যক্তির ঘরে গুরুত্বের সাথে যে জিয়াফত খাওয়ার প্রচলন রয়েছে, তা অন্যায় ও গর্হিত কাজ। এ অমানবিক ও শরীয়ত বিরোধী প্রথা আমাদের সকলকে বর্জন করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন।

দিন-তারিখ ধার্য করে মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সাওয়াব করা

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা, দানখয়রাত করা, বিনিময় ছাড়া কোরআন পাঠ করে সাওয়াব পৌঁছানো এবং অনুরূপভাবে নফল নামায, নফল রোযা এবং হজ্জ ইত্যাদির মাধ্যমে ইসালে সাওয়াব করা জায়েয এবং বিধিসম্মত। কিন্তু এসব ইসালে সাওয়াব করার জন্য ইসলামী শরীয়ত কোনো দিন-তারিখ বেঁধে দেয়নি। তাই এর জন্য দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে নেয়া বিদআত। ইসলামী শরীয়তের দলীল চতুষ্টয়ের অর্থাৎ কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের কোথাও এমন কোনো নির্দেশনা বা আকার-ইঙ্গিত নেই, যা দ্বারা ইসালে সাওয়াবের জন্য দিন-তারিখ ধার্য করা জরুরি মনে করা যায়; বরং যতদূর জানা যায়, বিধর্মীদের প্রথা এ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ রপ্ত করে নিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায় সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ মেনে প্রয়াতদের নামে শ্রাদ্ধ ইত্যাকার অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে

থাকে। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আল্লামা বেরুনী লেখেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কাঁধে যে-সব বর্তায় তা হলো, শ্রাদ্ধ করা এবং মৃত্যুর একাদশ ও পঞ্চদশতম দিনে খাদ্য খাওয়ানো। প্রতি মাসের ষষ্ঠ তারিখের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তাদের মাঝে। অনুরূপ বছরপূর্তি দিবসে খাবারের আয়োজন করাও তারা অপরিহার্য মনে করে। (কিতাবুল হিন্দ, পৃষ্ঠা : ২৭)

মুসলমানগণ সুখ্যাতি লাভের আশায় অবিকল এসব প্রথা পালন করে। তারা মৃত্যুর চতুর্থ দিন, চল্লিশতম দিন এবং বছরপূর্তিতে জিয়াফতের আয়োজন করে থাকে।

মাওলানা খলীল আহমদ রহ. (মৃত্যু, ১৩৪৬ হি.) লেখেন, 'মৃত্যুর তৃতীয় দিবস পালনের এ রেওয়াজ একমাত্র ভারতবর্ষেই পরিলক্ষিত হয়; বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এ রেওয়াজ নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের 'তিজা' অনুষ্ঠান থেকেই তা ধার করে আনা হয়েছে।' (আল বারাহিনুল কাতিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১১১)

কুলখানি, চল্লিশা, চেহলাম, তৃতীয় দিবস ও সপ্তম দিবস পালন এবং মৃত ব্যক্তির ঘরে জিয়াফত খাওয়া সম্পর্কে অন্যান্য মাযহাবের ফিকহবিদদের ন্যায় হানাফী ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গিও নেতিবাচক। তারা সবাই এক বাক্যে এসব বিদআতের নিন্দা করেছেন। আল্লামা তাহের ইবনে আহমাদ হানাফী রহ. লেখেন,

وَلَا يُبَاحُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ عِنْدَ ثَلَاثَةِ أَيامٍ لِأَن الضّيَافَةَ يُتخَذُ عِنْدَ السرُورِ

> 'মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে মৃত ব্যক্তির স্বজনদের পক্ষ থেকে জিয়াফতের আয়োজন করা বৈধ নয়। কারণ জিয়াফত আনন্দ উপলক্ষ্যে করা হয়ে থাকে।' (খুলাসাতুল ফাতাওয়া : ২/৩৪২)

ইমাম হাফিজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে শিহাব কিরদারী হানাফী রহ. বলেন, 'মৃত্যুর পর তিনদিন যাবত জিয়াফত করা এবং তা খাওয়া মাকরূহ। কারণ জিয়াফত সাধারণত আনন্দ ফুর্তির সময়ে হয়ে থাকে। প্রথম দিবস, তৃতীয় দিবস এবং সপ্তাহ অতিক্রান্তে খাবারের আয়োজন করা মাকরূহ। ঈদ মওসুমে ভোজসভার আয়োজন করা এবং বিভিন্ন মওসুমে কবরের নিকট

খাদ্য নিয়ে যাওয়া বা পাঠানোও মাকরূহ। কোরআন পাঠের উদ্দেশ্যে কারী ও মৌলভি সাহেবদের ডেকে আনা ও সমবেত করা এবং সূরা আনআম, সূরা ইখলাস প্রভৃতি পাঠ উপলক্ষ্যে খাবারের আয়োজন করাও মাকরূহ।' (ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়া : ৪/৮১)

উদ্ধৃত ভাষ্যসমূহ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে ভোজ অনুষ্ঠান করার এবং সেজন্য নির্দিষ্টরূপে দিন-তারিখ ধার্য করে রাখা এবং বিশেষত তৃতীয়, দশম ও চল্লিশতম দিনে উক্ত অনুষ্ঠান করা বিদআত ও মাকরূহ। এরূপ অনুষ্ঠান সকলের বর্জন করা উচিত।

আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম

আযানের আগে বা পরে আযানের শব্দাবলির সাথে মিলিয়ে উচ্চস্বরে দরূদ পড়া বিদআত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে কেউ এরূপ করেছেন মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। যতটুকু জানা যায়, সর্বপ্রথম ৭৬০ হিজরীর পরে কায়রোর মুহতাসিব সালাউদ্দিন আবদুল্লাহ বুরুলুসী আযানের পরে সালাত ও সালাম পড়ার রেওয়াজ প্রচলন করেন। তিনি প্রথমে মিশর ও তাঁর শাসনাধীন এলাকাসমূহে কেবল জুমুআর রাত্রিতে আযান সমূহে সালাত ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এ রীতি প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট হলো, মিশরের জনৈক গভর্নর আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর তাঁর মা আযানের সময় السَّلَامُ عَلَى الْإِمَامُ الطَّاهِرِ বলে তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণের জন্য মুআফ্ফিনদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন। এর কিছুদিন পর থেকে বিভিন্ন খলীফার নামে আযানের সময় সালাম প্রচলনের রীতি চালু হয়। অবশেষে মুহতাসিব সালাউদ্দিন আবদুল্লাহ বুরুলুসী এ রীতি বাতিল করেন এবং এর পরিবর্তে জুমুআর রাতের আযানগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম প্রেরণের নতুন রীতি চালু করেন। (আল-ফাতাওয়া ফিকহিয়াতুল কুবরা : ১/১৩১)

অবশ্য এর পূর্বে সুলতান সালাউদ্দিন ইবনে আউয়ুবের আমলে প্রত্যেক রাতে ফজরের নামাযের আগে মিশর ও শামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পড়ার রীতি প্রচলন লাভ করেছিল। (আল-মাওয়াতুল ফিকহিয়াহ : ২/৩৬২)

এরপর মিসরের সুলতান হাজী ইবনুল আশরাফ শাবান ইবনে কালাউনের আমলে ৭৯১ হিজরিতে মুহতাসিব নাজমুদ্দিন আত-তাম্বাদীর দ্বারা এ নতুন রীতিটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনিই সর্বপ্রথম প্রত্যেক আযানের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, মুহতাসিব নাজমুদ্দিন আত-তাম্বাদী ছিল একজন অসৎ, মুর্খ ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল শাসক। আযানের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পড়ার এ রেওয়াজ ক্রমান্বয়ে সাধারণ জনমানুষের মধ্যে এ ধারণার জন্ম দেয় যে, এটাও আযানের অংশবিশেষ, যা বাদ দেওয়া কোনোক্রমেই জায়েয নয়। (আল ইবদা : ২৬৮, ২৬৯)

বর্তমানে আমাদের দেশের কোনো কোনো অঞ্চলের মসজিদেও আযানের অব্যবহিত পূর্বে নবীজির প্রতি সালাত ও সালাম পাঠের এ রেওয়াজ চালু হয়েছে।

এতে কারো দ্বিমত নেই যে, আযানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করতে নিষেধ নেই। এমনকি আযানের আগেও যে কেউ ইচ্ছে করলে ফযীলত ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে দরূদ পাঠ করতে পারে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই, যদি তা আযানের শব্দাবলির সাথে মিলিয়ে উচ্চস্বরে পড়া না হয়। আযানের পর প্রত্যেক আযান শ্রবণকারী ব্যক্তির দরূদ পড়ার প্রসঙ্গ বিশুদ্ধ হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মুয়াযযিন বা গায়রে মুয়াযযিনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلاة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُو اللهَ فِي الْوَسِيلَة فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ فِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

‘যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেভাবে বলবে তোমরাও সেভাবে বলবে। অতঃপর তোমরা দরূদ পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরূদ

পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। এরপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলার প্রার্থনা করবে। উসিলা হলো বেহেশতের একটি বিশেষ মর্যাদা, যা আল্লাহর একজন বান্দাই কেবল অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। আমি আশা রাখি, আমিই সে ব্যক্তি হব। অতএব, যে আমার জন্য ওসীলার প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

এ হাদীস থেকে জানা যায়, আযানের পরে দরূদ পড়তে হবে। তবে তা অবশ্যই আযানের শব্দাবলির সাথে মিলিয়ে উচ্চস্বরে নয়; বরং নিম্নস্বরেই পড়তে হবে। হয়তো কেবল নিজের কানে শুনবে, অথবা কাছের কেউ শুনতে পাবে। বর্তমানে আযানের অব্যবহিত আগে বা পরে উচ্চ ও সুরেলা কণ্ঠে সালাত ও সালাম পড়ার যে রেওয়াজ চালু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিদআত। এ রীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে প্রাপ্ত আযানের রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি এবং নতুন উদ্ভাবিত ।

ইবনে হাজার আল-হাইসামী রহ. বলেন, 'বর্তমানে প্রচলিত রীতিতে যেভাবে মুয়াযযিনরা আযানের পরে সালাত ও সালাম পাঠ করে থাকেন, সে প্রসঙ্গে আমাদের পূর্বসূরিদের থেকে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁরা ফাতাওয়া দেন, اَلْأَصْلُ سُنَّةٌ وَالْكَيْفِيَّةُ بِدْعَةٌ মূল কাজটি সুন্নাত; তবে তার আদায়ের ধরনটি বিদআত।' (আল-ফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাহ আল-কুবরা : ১/১৩১)

ইমাম শারানী রহ. নিজের শায়খ থেকে বর্ণনা করে বলেন, 'মুয়াযযিনরা আযান দেওয়ার সময় যে সালাত ও সালাম পড়েন, তা খোলাফায়ে রাশেদীনদের যুগে ছিল না; বরং মিসরের রাফেযীদের আমলে ছিল। (আল-ইবদা, পৃষ্ঠা : ২৭০)

মোদ্দাকথা, আযান ইসলামের একটি নিদর্শন। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। উপরন্তু আযানের শব্দাবলি হাদীস ও ফিকহের কিতাবসমূহে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোর উপর উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অবস্থায় আযানের অব্যবহিত আগে বা পরে সালাত ও সালামের

সংযোজন নিঃসন্দেহে অতি উৎসাহীদের উদ্ভাবিত একটি বিদআত। তাই শরীয়তের নামে নিজ থেকে কিছু উদ্ভাবন না করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই উত্তম। আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন।

ওলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলার অপচেষ্টা

অতি দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজ সুন্নাতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত উপমহাদেশের যে দেওবন্দ মাদরাসা রয়েছে, তার অনুসারী ওলামায়ে কেরামকে কিছু অজ্ঞ বন্ধু ওহাবী বলার চেষ্টা করে থাকেন। তাদের এ আচরণ কেবল দুঃখজনকই নয়; বরং তা রীতিমতো নিন্দনীয়। কেননা ওহাবী মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ওলামায়ে দেওবন্দ সবসময় এ ওহাবী মতবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে এবং তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছে। তাই ইতিহাস না জেনে অজ্ঞতার বশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী এ জামাতটিকে ওহাবী বলা নিতান্তই বোকামি।

ওহাবী ও ওহাবী মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য এবার পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু আলোচনা পেশ করছি।

উল্লেখ্য, নিম্নে আবদুল ওয়াহহাব নজদী ও তার চিন্তাধারা নিয়ে যে আলোচনা আমি পেশ করতে যাচ্ছি, তা আমার হাদীসের উস্তাদ, বর্তমান দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক, আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহ.) রচিত ‘আল-বায়ানুল ফাসিল বাইনাল হক্কি ওয়াল বাতিল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। আশা করি এ উদ্ধৃতির পর ওলামায়ে দেওবন্দকে কেউ আর ওহাবী বলার ধৃষ্টতা দেখাবে না।

আবদুল ওয়াহহাব নজদীর আত্মপ্রকাশ

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী তেরোশো শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবের নজদ নামক প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করেন। যেহেতু তার ধ্যানধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস ছিল ভ্রান্ত, তাই সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে

হানাহানি ও যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদেরকে জোরপূর্বক স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী করার চেষ্টা করে। তাদের সম্পদকে সে গনিমতের মাল ও হালাল মনে করে এবং তাদেরকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ মনে করে। সাধারণত মক্কাবাসী ও বিশেষত হারামাইন শরীফে অবস্থানকারীদের সে অনেক নির্যাতন করে।

সালফে সালেহীন ও তাদের অনুসারীদের শানে নিতান্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে। তার নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেকে মক্কা মদীনার পুণ্যভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে তার বাহিনী শহীদ করে। সংক্ষেপে বলা যায়, সে ছিল একজন স্বেচ্ছাচারী, ধর্মান্ধ ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। তাই বিশেষত আরববাসী ও সমস্ত মুসলমানগণ তাকে ও তার অনুসারীদের ঘৃণা করেন।

ওয়াহাবী চিন্তাধারা

১. ওয়াহাবীগণ কোনো নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণকে রিসালাতে অংশীদারিত্ব মনে করে। প্রসিদ্ধ চার ইমাম ও তাঁদের অনুসারীদের ব্যাপারে জঘন্য উক্তি করে থাকে। তাই অনেক মাসআলায় তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধী হয়ে গেছে।

   আরবের ওয়াহাবীগণ যদিও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর অনুসরণের দাবিদার, কিন্তু মাসাইলের মধ্যে তাদের আমল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতবাদের উপর নেই। বরং স্বীয় ধারণামতে তারা যে মাসাইলকে হাদীসের পরিপন্থি মনে করে, তা সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করে। উপমহাদেশের মাযহাব ত্যাগীদের ন্যায় তারাও উম্মতের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগে অভ্যস্ত।

২. আবদুল ওয়াহহাব নজদী ও তার অনুসারীদের আজও এ ধারণা, (নাউযুবিল্লাহ) আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবন শুধু ইহকাল পর্যন্ত সীমিত। মৃত্যুর পর তাঁরা এবং অন্যান্য ঈমানদারগণ কবরের জীবনে একাকার। তারা হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এত জঘন্য ভাষা তারা ব্যবহার করে, যা উচ্চারণ করাও জায়েয মনে হয় না।

৩. ওয়াহাবীগণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে নিতান্ত

বেআদবীমূলক শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তারা নবীজির মর্যাদাকে শুধু দ্বীন পৌঁছানোর দায়িত্বের সাথে সীমিত মনে করে। যে নবীর জন্ম না হলে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্ব লাভ করত না, সেই নবীকে এত সীমিত মনে করা গোস্তাখি ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা তাঁর রওজা শরীফের উদ্দেশ্যে যিয়ারতকে এই হতভাগারা হারাম বলে মনে করে।

৫. আত্মশুদ্ধি ব্যবস্থা, সূফিদের নিয়ম-নীতি ও মুরাকাবা ইত্যাদি তথা পীর-মুরিদীকে তারা বিদআত ও হারাম মনে করে।

৬. ওয়াহাবীদের বিশ্বাস হচ্ছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল ইলমে শরীয়ত জানতেন, (নাউযুবিল্লাহ) অন্য কোনো ইলম তাঁর ছিল না। অর্থাৎ, ইলমে বাতেন বলতে কিছুই তাঁর ছিল না।

৭. ওয়াহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অতিমাত্রায় দরূদ পড়াকে অপছন্দ করে এবং বারণ করে থাকে।

৮. ওয়াহাবীগণ স্বীয় দল ব্যতীত অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক ও কাফির মনে করেন। তাই তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করাকে বৈধ মনে করেন।

এই ছিল ওয়াহাবী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার কিছু নমুনা। এছাড়া তাদের আরও জঘন্য কিছু ধ্যানধারণা রয়েছে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কথা জোরগলায় বলা যায়, উলামায়ে দেওবন্দই কেবল এ ভ্রান্তিপূর্ণ আকীদার বিরোধিতা করে জনগণকে সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ছায়াতলে নিয়ে এসেছে। তাই এদেরকে যারা ওয়াহাবী বলে, তারা ইংরেজদের চক্রান্তে পড়ে আছে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় ইংরেজরাই উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারটি চালিয়েছিল। আল্লাহ সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

॥ সমাপ্ত ॥

পাঠকের পাতা